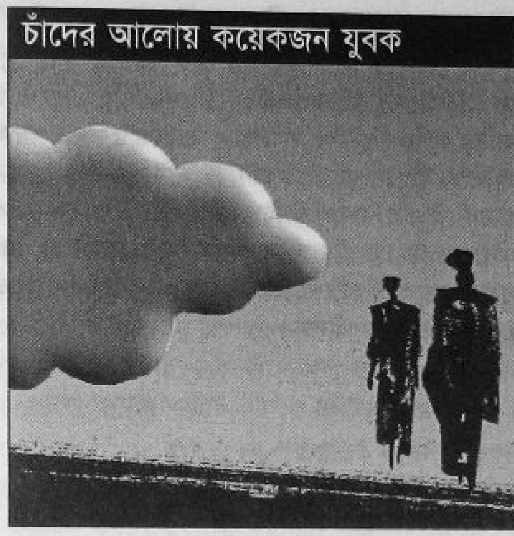

Chander Aloy Koekjon Jubok_Humayun Ahmed

suman_ahm@yahoo.com

আসুন আপনাদের কয়েকজন যুবকের একটি গল্প বলি।

গল্পটি মিথ্যা, তবে যে শহর নিয়ে এই গল্প সেই শহরটি সত্যি। যে চাঁদের আলোয় গল্প সাজানো হয়েছে সেই চাঁদের আলোও সত্যি। যাদের নিয়ে এই গল্প তারাও আছে এবং গল্পের ঘটনাটিও সত্যি সত্যি ঘটেছিল। তাহলে শুরুতে কেন বললাম গল্পটি মিথ্যা ? এরকম বলার কারণ হচ্ছে চাঁদের আলো। ঘটনাটি ঘটেছিল এক আশ্বিন মাসের রাতে— উথাল পাথাল জোছনায়। উথাল পাথাল চাঁদের আলো একটি অদ্ভুত ব্যাপার। এই আলোয় এক ধরনের ভ্রান্তি মিশে থাকে। সেই ভ্রান্তির কারণে সত্যিকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যি বলে মনে হয়। আসুন তাহলে গল্প শুরু করি। প্রথমেই গল্পের যুবকদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই। প্রথম যুবকটির নাম আলম।

১

শামসুল আলম।

সে তিন বছর আগে সোসিওলজিতে এম.এ. পাশ করেছে। তার বয়স পঁচিশ। একহারা গড়ন। লম্বাটে মুখ। চোখ দু'টি বড় বড় বলেই সব সময় সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে আছে এ রকম মনে হয়। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে ডাকা হত 'খোকা বাবু' বলে। এই নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে তার চরিত্রে শান্ত ভাবটি প্রবল।

তিন বছর ধরে শামসুল আলম চাকরি খুঁজছে। এই তিন বছরে একবার সে চাকরির নিয়োগপত্র পেল। একটি প্রাইভেট কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। চাকরির শর্ত হচ্ছে নিয়োগের আগে দু'জন গেজেটেড অফিসারের ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট এবং জামানত হিসেবে নগদ কুড়ি হাজার টাকা জমা দিতে হবে। কুড়ি হাজার টাকার ব্যবস্থা না হওয়ায় চাকরি হল না। ভাগ্যিস হয় নি। কারণ কোম্পানিটা ছিল ভুয়া। আলমের পরিচিত একজন কুড়ি হাজার টাকা জমা দিয়েছিল। তাকে কাগজপত্র দিয়ে চিটাগাং অফিসে যেতে বলা হল। দেখা গেল চিটাগাং-এর ঠিকানায় একটা রেস্টুরেন্ট চলছে। ঐ কোম্পানির নামও কেউ শুনে নি।

আলমের বাবা সাইফুদ্দিন সাহেব ছোটখাট মানুষ। তিনি একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির মাঝারি ধরনের অফিসার। ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে যারা চাকরি করে তারা সহজে কারো উপর রাগ করে না। সাইফুদ্দিন সাহেবও করতেন না— শান্তশিষ্ট নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন তবে ইদানীং তাঁরও ধৈর্য-চ্যুতি হয়েছে। তিনি প্রায়ই বলছেন যে, আলমের মত বড় গাধা তিনি তাঁর জীবনে দেখেন নি। তিন বছরে যে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারে না সে তো গাধারও অধম। অবশ্যি এই কথাগুলি তিনি সরাসরি আলমকে বলেন না। কারণ তাঁর বড় ছেলেকে তিনি বেশ পছন্দ করেন।

শেষ পর্যন্ত আলম একটা চাকরি পেল। কোনো রকম ইন্টারভ্যু ছাড়াই চাকরি। ফরিদপুর আবু নসর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। স্কুল কমিটির সেক্রেটারী তাকে জানালেন যে স্কুলটি অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত। স্কুলের আর্থিক অবস্থাও ভাল। প্রতি

মাসের প্রথম সপ্তাতেই বেতন হয়। শিক্ষকদের থাকার জায়গা আছে। পল্লী-বিদ্যুতায়ন প্রকল্পে অতি সত্বর স্কুলে বিদ্যুৎ চলে আসবে ইত্যাদি।

আলমের এই চাকরি নেবার কোনো ইচ্ছা নেই। তার মন বলছে একবার এই চাকরিতে ঢুকলে আর বের হওয়া যাবে না। তবে সাইফুদ্দিন সাহেব তাকে প্রবল চাপের মধ্যে রাখছেন। রোজই বোঝাচ্ছেন— স্কুল মাস্টারি খারাপ কী ? এডুকেশন লাইন হচ্ছে বেস্ট লাইন, দেশের সেবা হবে। পড়াশোনা নিয়ে থাকবি। স্কুল টিচারদের এখন নানান রকম সুযোগ সুবিধা। গ্রামের মধ্যে টাকা খরচের জায়গা নেই। বেতন যা পাবি সবটাই জমবে। শহরের পাঁচ হাজার টাকা আর গ্রামের দু'হাজার টাকা হচ্ছে ইকুভেলেন্ট। তাছাড়া মাস্টারি করতে করতে বি.সি.এস-এর প্রিপারেশনও নিতে থাক। বইপত্র সঙ্গে নিয়ে যা। নিরিবিলিতে পড়বি। এদিকে খোঁজ খবরতো আমরা করছি। আমেরিকাতে তোর ছোট মামাকে বলা আছে কোনো ব্যবস্থা করতে পারলে তোকে নিয়ে যাবে।

আমেরিকার ছোট মামা হচ্ছে আলমদের পরিবারের বাতিঘর। কোনো সমস্যা হলেই তাঁর কথা সবার মনে পড়ে। সবার ধারণা তাঁকে চিঠি লিখলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চিঠি লেখা হয়— কখনো কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। ছোট মামা নববর্ষ উপলক্ষে চমৎকার সব কার্ড পাঠান। সেই সব কার্ডের কোণায় লেখা থাকে— কার কী লাগবে জানাও। এই পর্যন্তই।

সাইফুদ্দিন সাহেব আলমকে সকাল বিকাল সন্ধ্যা এই তিনবার বোঝাতে চেষ্টা করেন স্কুল মাস্টারি ব্যাপারটা যে কত ভাল। সকালের যুক্তি বিকাল এবং সন্ধ্যাতেও দেন। আলম মাথা নিচু করে শুনে। কিছু বলে না।

বিসমিল্লাহ বলে জয়েন করে ফেল। একবার মাস্টারি শুরু করলেই যে সারাজীবন করতে হবে এমনতো কথা নেই। আমিওতো মাস্টারি দিয়ে শুরু করেছিলাম। দু'মাস মাস্টারি করেছি। এই দুই মাস ছিল আমার জীবনের বেস্ট পার্ট। বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। তোকে কত দিবে ?

একুশ শ।

মেলা টাকা। গ্রামে থাকবিতো কাজেই দেখবি পুরো টাকাটা সেভ হয়ে গেছে। মন খারাপ করিস না। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে চলে যা।

আচ্ছা।

দশটা টাকাও যদি সংসারে আসে তাহলেও সংসারে সুসার হয়। অবস্থাতো নিজের চোখেই দেখছিস। দেখছিস না ?

দেখছি।

সংসারের অবস্থা আলম দেখবে না কেন দেখছে, সেতো অন্ধ না। সংসারের অবস্থা ভয়াবহ। আগে এ রকম ছিল না দেখতে দেখতে হয়ে গেল। আলমের ছোট ভাই কামরুল বি.এ. পরীক্ষার দু'মাস আগে প্রায় ছ'ফুট লম্বা ভীষণ ফর্সা এক মেয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত। মেয়েটিকে সে নাকি কোর্ট ম্যারেজ করেছে। না করলে উপায় ছিল না। মেয়েকে জোর করে তার বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল।

সাইফুদ্দিন সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন, হারামজাদাকে জুতিয়ে বাড়ি থেকে বের কর। হারামজাদার ছায়া যেন আমি না দেখি।

তাঁর সংহার মূর্তি দেখে জড়সড় হয়ে থাকা লম্বা মেয়েটি কেঁদে কেটে অস্থির। সাইফুদ্দিন সাহেবের হৃদয়ে এই দৃশ্যও কোনো ছায়াপাত করল না। তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, লম্বুকে নিয়ে এক্ষুণি বের হ। এক্ষুণি। ইমিডিয়েট।

তারা অবশ্যি কোথাও গেল না। যাবে কোথায় ? যাবার জায়গা নেই। কামরুল শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল। নতুন মেয়েটি দেখা গেল কাঁদার ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট। সারাক্ষণই কাঁদছে। এই ঘটনার তিন মাসের মধ্যে খুলনা থেকে আলমের বড় বোন রীতা এসে উপস্থিত।

তার সঙ্গে চারটা বড় বড় স্যুটকেস এবং তিন মেয়ে। রীতা এম্নিতেই বেশ হাসি খুশি। দেখা গেল তার এবারের হাসি খুশির মাত্রা অন্য বারের চেয়েও বেশি। সব কিছু নিয়েই হাসছে, মজা করছে। মাকে বলল, তোমার সঙ্গে কয়েক মাস থাকবো মা। খুলনার লোনা পানি সহ্য হচ্ছে না।

মা বললেন, বেশতো থাকবি। তোর মেয়েদের স্কুলের ক্ষতি হবে না তো ?

না। ওদের বাবা এসে ওদের নিয়ে যাবে।

তুই থাকবি ?

হুঁ।

তুই একা থাকবি কীভাবে ?

বললামতো মা খুলনার লোনা পানি সহ্য হচ্ছে না। মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে। এক সময় দেখবে মাথায় টাক পড়ে যাবে।

তোর কী হয়েছে সত্যি করে বলতো ?

বললামতো কিছু হয় নি। লোনা পানি সহ্য হচ্ছে না।

রীতা কিছু না বললেও জানা গেল ব্যাপার জটিল। বেশ জটিল। রীতার স্বামী কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার মুখলেস সাহেব দু'মাসের মধ্যে কোনো খোঁজ খবর করলেন না। শুধু মনি অর্ডার করে রীতার মার নামে আড়াই হাজার টাকা পাঠালেন। রীতা কাঁদতে কাঁদতে বলল, এই টাকা যদি তোমরা রাখ তাহলে আমি ট্রাকের সামনে লাফিয়ে পড়ব। আল্লাহর কসম আমি ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দেব। টাকা ফেরত গেল। কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার মুখলেস সাহেব আর কোনো রকম খোঁজ খবর করলেন না। সাইফুদ্দিন সাহেব উকিলের চিঠির মারফত জানতে পারলেন চারিত্রিক দোষের কারণে মুখলেসুর রহমান তাঁর স্ত্রী মাসুদা রহমান ওরফে রীতাকে ইসলামি বিধি মোতাবেক তালাক দিয়েছেন। তার তিন কন্যা বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মাসুদা রহমানের সঙ্গেই থাকবে এবং তাদের খরচপত্র দেয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সাইফুদ্দিন সাহেব হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।

প্রথমবার বি.এ. ফেল করার পর কামরুল দ্বিতীয়বারও ফেল করল। যেদিন রেজাল্ট হল তার পরদিন তার স্ত্রী দু'টি জমজ বাচ্চা প্রসব করে মর মর হয়ে গেল। মেয়ে মানুষের জীবন সহজে বের হয় না বলেই সে কোনোক্রমে টিকে গেল। কামরুলের বর্তমানে

একমাত্র কাজ হচ্ছে দুই বাচ্চাকে কোলে করে ঘুম পাড়ানো এবং রাতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করা। ঝগড়ার এক পর্যায়ে বলা, খবরদার আমি কিন্তু খুন করে ফেলব। সত্যি খুন করে ফেলব। খুন করে ফাঁসি যাব।

তার স্ত্রী এই কথার উত্তরে খুবই ঠাণ্ডা গলায় বলে, দয়া করে তাই কর। খুন করে দেখাও যে একটা কাজ তুমি করতে পার। একেবারে অপদার্থ তুমি না।

কি আমাকে অপদার্থ বললি ?

হ্যাঁ বললাম। অপদার্থকে অপদার্থ বললে দোষ হয় না।

ঘরে তখন হুটোপুটির শব্দ শোনো যায়। জমজ বাচ্চা দু'টি এক সঙ্গে কাঁদতে থাকে। সাইফুদ্দিন সাহেব চটি ফটফটিয়ে এগিয়ে আসেন। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলেন, হচ্ছে কী এসব ? এই হারামজাদা জুতিয়ে তোকে ঠাণ্ডা করব। এক্ষুণি তুই তোর লম্বুকে নিয়ে বেরিয়ে যা। এই মুহূর্তে। খোল হারামজাদা দরজা খোল।

কামরুল দরজা খুলে না। তবে হুটোপুটির শব্দ থেমে যায়। জমজ বাচ্চা দু'টি শুধু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে। সাইফুদ্দিন সাহেব চোখে অন্ধকার দেখেন। আলমও অন্ধকার দেখে। গাঢ় অন্ধকার।

আজ আশ্বিন মাস।

বারই আশ্বিন। পূর্ণিমার সন্ধ্যা। শহরে পূর্ণিমার চাঁদ সন্ধ্যা মেলাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় না। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। শহরের মানুষ পূর্ণিমার চাঁদ নিয়ে মাথা ঘামায় না। পূর্ণিমা অমাবস্যা শহুরে ব্যাপার নয়।

আলম আজকের পূর্ণিমার ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না। সন্ধ্যা মেলাবার পর সে যথারীতি প্রাইভেট টিউশনিতে বেরিয়ে গেল। তাদের বাসার কাছেই তিথি নামের একটা মেয়েকে সে ইংরেজি পড়ায়। মেয়েটি দু'বছর ধরে এস.এস.সি. দিচ্ছে। এইবার নিয়ে হবে তৃতীয় দফা। মনে হচ্ছে এবারও কোনো উনিশ বিশ হবে না। তিথির চেহারাটা মিষ্টি, তার চোখের মণি দু'টিতে এক ধরনের স্নিগ্ধতা আছে। সে কথাও বলে গানের মত সুরে। মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে যে আলমের ইচ্ছে করে তার পিঠে হাত রেখে বলতে— এই কী হয়েছে ? এত হাসি কীসের ?

আলম তিথিকে পড়াতে গেলেই ভাবে— এরকম চমৎকার একটা মেয়ে পড়াশোনায় এত গাধা হল কী করে ? দু'মাস ইংরেজি টেনস পড়াবার পরেও আমি ভাত খাই-এর ইংরেজি সে লেখে— I am rice eating.

আলম তিথিদের বাড়ির দরজার কলিং বেলে হাত রাখার আগেই তিথি বেরিয়ে এসে বলল, আজতো স্যার পড়ব না।

পড়বে না কেন ?

আজ পূর্ণিমা!

পূর্ণিমাতে পড়া যায় না নাকি ?

যায়। যাবে না কেন ? তবে আমার মামাতো বোনরা সবাই এসেছে। আমরা ঠিক করেছি শাড়ি পরে আজ সারা রাত ছাদে বসে গান করব।

তুমি গানও জান ?

আমিতো স্যার ছায়ানটে গান শিখি। আমার এবার থার্ড ইয়ার। থার্ড ইয়ারে আমি ফার্স্ট হয়েছি।

পড়াশোনা ছাড়া আর সবই দেখি তুমি ভাল জান।

তিথি মিষ্টি করে হাসল। আলম বলল, আমি কি তাহলে চলে যাব ?

স্যার এক মিনিট দাঁড়ান। আপনার বেতন আব্বা আমার কাছে দিয়ে গেছেন।

মাসতো এখনো শেষ হয় নি।

আব্বা সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন, পনেরো দিন পরে ফিরবেন।

টাকা নেবার সময় তিথির আঙুলের ছোঁয়া লেগে গেল। তিথি এমন চমকে উঠল যে আলম অবাক হয়ে তাকাল। তিথি মাথা নিচু করে আছে। তার শরীর কাঁপছে। তিথি ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার একটু চা খেয়ে যান।

না থাক।

চা বানানোই আছে। যাব আর নিয়ে আসব। একটু বসুন। আমার মামাতো বোনেরা আপনাকে দেখতে চায়।

আলম বিস্মিত হয়ে বলল, আমাকে দেখতে চায় কেন ?

তিথির ঠোঁটে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা। কিছু একটা বলতে গিয়েও সে বলল না। আলম বলল, আজ আমার একটু কাজ আছে। আজ যাই। তোমরা যাও ছাদে বসে গান কর।

আমরা স্যার আজ সারারাত গান করব। আমার ফুফাতো বোনরাও আসবে।

ভাল। খুব ভাল।

তিথিদের বাড়ি থেকে বের হয়েই আলম টাকা গুনল। তিনশ টাকা করে দেবার কথা। প্রায়ই টাকা কম থাকে। গত মাসে বিশ টাকা কম ছিল। এর আগের মাসে ছিল দশ টাকা কম। দশ বিশ টাকা কম হলে সেটা আর বলা যায় না। মেজাজ শুধু অসম্ভব খারাপ হয়ে যায়। আজ হিসেব ঠিক আছে। দু'টা একশ টাকার নোট, দুটা পঞ্চাশ টাকার নোট। আলম একটা পঞ্চাশ টাকার নোট আলাদা করে রাখল। বাকি টাকাটা মাকে দিয়ে দিতে হবে। ঘরে টাকা পয়সার অবস্থা খুবই খারাপ। সকালে পুরনো খবরের কাগজ এবং টিনের কৌটা বিক্রি করে বাজার হয়েছে। তাও চিনি কেনা হয় নি। চিনির অভাবে ভোরবেলা চা হয় নি।

বাড়িতে পা দিতেই আলমের মা বললেন, তোর কাছে টাকা আছে নাকিরে আলম ? বৌমার বাচ্চাগুলির দুধ শেষ হয়ে গেছে। বাকির দোকানে পাঠিয়েছিলাম। বাকি দিচ্ছে না। তোর বাবা নিজে গিয়েছিলেন। দোকানদার তাঁকে কী সব বলেছে ঘরে এসে উনি কামরুলের সঙ্গে আজেবাজে সব কথা বললেন। বউটা তখন থেকে কাঁদছে।

কী বলেছেন বাবা ?

সব সময় যা বলেন তাই বলেছেন। কামরুলকে বলেছেন— তুই তোর তালগাছ নিয়ে বেরিয়ে যা। নিজের পথ দেখ। বউটা তখন থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তুই কোনখান থেকে কিছু টাকা আনতে পারবি ?

আলম আড়াইশ টাকা মার হাতে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি মা। ফিরতে দেরি হবে।

যাবি কোথায় ?

এই রাস্তায় ঘুরব। যাব আবার কোথায় ?

তুই কি স্কুলের চাকরিটা নিবি ?

জানি না। নিতেও পারি।

নিয়ে নে বাবা। না নিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে— এদিকে রীতার আবার...

তিনি কথা শেষ করলেন না। আলম বলল, বড় আপার আবার কী হয়েছে ?

না কিছু না। তুই কি রাতে ভাত খাবি ?

হ্যাঁ, খাবার ঢাকা দিয়ে রেখো।

আলম এসে বারান্দায় এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। লম্বা মেয়েটা বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার গাল ভেজা, ভেজা গালে চাঁদের আলো পড়েছে। সমস্ত মুখ চিকচিক করছে। আলমের ইচ্ছা হল বলে— তুমি বাবার কথায় কিছু মনে করো না। অভাবে অনটনে বাবার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি তোমার বাচ্চা দু'টির কাছে যাও।

কথাগুলি বলা হল না। এই মেয়েটির সঙ্গে আলমের কখনো কথাবার্তা হয় না। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগে।

আলম রাস্তায় নেমেই পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল পঞ্চাশ টাকার নোটটা ঠিক আছে কিনা— না ঠিক আছে। নোটটা খরচ করা যাবে না। এ মাসের কয়েকটা দিন এবং সামনের মাসের ত্রিশ দিন পড়ে আছে।

আলম আকাশের দিকে তাকাল। তখনি প্রথম বারের মত চোখে পড়ল আকাশে বিশাল চাঁদ উঠেছে। চট করে যে কথাটা তার মনে হল তা হচ্ছে— তিথিরা কি গান শুরু করেছে ?

আলম হাঁটছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। সে কোথায় যাবে এখনো ঠিক করেনি। হয়ত কোথাও যাবে না। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবে। একা হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। মজিদের কাছে গেলে কেমন হয় ? মজিদের কাছে গেলে সময়টা ভাল কাটবে। তবে মজিদ অনেকটা দূরে থাকে। উত্তর শাহজাহানপুরে। এত দূর সে যাবে ? যাওয়া যায়। মজিদের কাছে গেলে ভাল লাগবে। মনটা কেমন হয়ে আছে। মজিদের সঙ্গে গল্প-গুজব করলে মনটা ভাল হবে।

২

দ্বিতীয় যুবকের নাম মজিদ। আবদুল মজিদ। আবদুল মজিদের কাছে এলে তার বন্ধু-বান্ধবদের সময় ভাল কাটে এই তথ্য মজিদের ফুপু এবং ফুপা দু'জনের কেউই জানেন না। তারা মজিদকে চেনেন একজন অপদার্থ, অকর্মণ্য স্বল্পবুদ্ধির মানুষ হিসেবে— ইতিমধ্যেই চোর হিসেবে যার কিঞ্চিৎ অখ্যাতি রটেছে।

মজিদ ছোটখাট একজন মানুষ। সাধারণত ছোটখাট মানুষের স্বাস্থ্য ভাল হয়, মজিদের তা না। সে বেশ রোগা। স্কুলে তার নাম ছিল স্ক্রু ড্রাইভার। এই বিচিত্র নামের তেমন কোনো ইতিহাস নেই। স্কুলে প্রতিভাবান ছেলে হিসেবে তার খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা দুই-ই ছিল। তবে তার প্রতিভা পড়াশোনার খাতে বয় নি। তার প্রতিভার সবটাই ছিল অনুকরণে। সে যে কোনো মানুষের চরিত্র একটি কথা বা ক্ষুদ্র একটি ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে পারত। আর পারত উল্টো কথা বলতে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে উল্টো করে জবাব দিত এবং তা এত দ্রুত বলে দিত যে মনে হত সে এই ভাবেই কথা বলে। যেমন কেউ যদি বলত, কেমন আছিস মজিদ। সে বলত, লভা, ইতু নমকে। অর্থাৎ ভাল, তুই কেমন ?

তার উল্টো কথা বলার খ্যাতি স্কুলের হেড স্যারের কানেও পৌছেছিল। তিনি তাকে একদিন ডাকিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ তার উল্টো কথা বলার বিদ্যা পরখ করলেন এবং শেষ মেষ বললেন, তুই একটা অসাধারণ ছেলে। ভাল মত পড়ালেখা করিস। আর কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলিস।

মজিদ ঘাড় কাত করে চলে এল তবে তার অসুবিধার কথা স্যারদের বা বন্ধু-বান্ধবদের কাউকে বলল না। যে দিন তার বাবা মারা গেল তার পরদিনও সে স্কুলে এল এবং অন্যান্য দিনের চেয়েও অনেক বেশি হাসি তামাশা করতে লাগল। 'সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে' গানটি সঠিক সুরে উল্টো করে গেয়ে সারা স্কুলে একটা হৈ-চৈ ফেলে দিল।

তার এত প্রতিভা তেমন কাজে লাগল না। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পর পর দু'বার ফেল করার পর মজিদের ফুপা তাকে তাঁর রেশন সপে ঢুকিয়ে দিলেন। বর্তমানে তার কাজ হচ্ছে চাল, চিনি এবং গম ওজন করা এবং তার ফুপা জমির সাহেবের কাছে গাল খাওয়া। জমির সাহেবের ধারণা মজিদের মত বড় গাধা বাংলাদেশে আর জন্মেনি। ভবিষ্যতেও যে জন্মাবে সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

ইদানীং তাঁর মনে হচ্ছে মজিদ শুধু যে গাধা তাই নয় খানিকটা হাত টানের অভ্যাসও আছে। মাঝে মধ্যে রেশন সপে চিনি কম পড়ছে। একবার কম পড়ল পাঁচ সের, আরেকবার তিন সের। তার কিছুদিন পর দেখা গেল আটার একটা বস্তা উধাও।

তিনি মজিদের হাতে একটা কোরান শরীফ দিয়ে বললেন, সত্যি কথা বল হারামজাদা। সত্যি কথা না বললে তোকে খুন করে ফেলব। বস্তা গেল কোথায় ?

মজিদ নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, আমি জানি না।

হাতে কোরান শরীফ আছে, খবরদার মিথ্যা কথা বলবি না।

মিথ্যা কথা শুধু শুধু কেন বলব ?

তুই বস্তা বিক্রি করে দিস নাই ?

না।

সত্যি কথা বল।

বলেছি তো।

বস্তা কোথায় গেল তুই জানিস না ?

জ্বি না।

জমির সাহেব আর রাগ সামলাতে পারলেন না, প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন। মজিদ উল্টে পড়ে গেল। মজিদের ফুপু বললেন, থাক বাদ দাও।

জমির সাহেব বললেন, বাদ দাও মানে ? একটা আটার বস্তায় কত আটা থাকে তুমি জান ? এই হারামজাদা আমাকে শেষ করবার জন্যে এসেছে। এই শোন, তুই এক্ষুণি বিদায় হ। এক্ষুণি। তোকে যেন এই বাড়ির ত্রিসীমানায় না দেখি।

মজিদ মেঝে থেকে উঠতে উঠতে বলল, জ্বি আচ্ছা।

জমির সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আবার জ্বি আচ্ছা বলে! এত বড় সাহস আবার বলে জ্বি আচ্ছা।

তিনি আরেকটি চড় কষালেন। এই চড়ের জন্যে মজিদ প্রস্তুত ছিল বলে সে পড়ল না।

বেরিয়ে যা এক্ষুণি বেরিয়ে যা। বিছানা বালিশ নিয়ে যা। চোরের চোর। আমার দোকান ফাঁক করে দিচ্ছে।

মজিদ বিছানা বালিশ নিয়ে বের হয়ে গেল। রাতটা কাটাল রেশন সপের বারান্দায়। পরদিন যথারীতি কাজ করতে লাগল। রেশন কার্ডে দাগ দিয়ে দিয়ে জিনিস ওজন করা। জমির সাহেব কিছু বললেন না। মজিদকে বিদায় করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। সে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। তার জন্যে তাকে কোনো বেতন দিতে হয় না। মজিদ কোনো হাত খরচ চায় না। সাপ্তাহিক ছুটি চায় না। মাঝে মাঝে জমির সাহেব যখন নতুন কাপড় কিনে দেন সে এমন ভঙ্গি করে যেন নিজের সৌভাগ্য সে বিশ্বাস করতে পারছে না। নতুন কাপড় পরে প্রতিবারই সে ফুপা এবং ফুপুকে কদমবুসি করে।

ছলছল চোখে তাকায় যেন সে আনন্দে কেঁদে ফেলবে। ফুপা-ফুপুর প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধার কোনো রকম ঘাটতি দেখা যায় না। তবে রাতে ঘুমুতে যাবার আগে সে বেশ কয়েকবার বলে, 'নখু রেক বলফে' যার মানে 'খুন করে ফেলব।'

আজ আশ্বিনের এই পূর্ণিমার রাতে মজিদের হাতে কোনো কাজ ছিল না। রেশন সপ শুক্র, শনি এই দুইদিন বন্ধ থাকে, আজ হচ্ছে শনিবার।

মজিদ বারান্দায় বসেছিল। আকাশে চাঁদের দিকে তার চোখ ছিল না। সে তাকিয়ে ছিল তার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিকে। গতকাল পাল্লার দড়ি ছিঁড়ে দশ কেজি ওজনের বাটখারা তার নখে এসে পড়েছে। নখ একেবারে থ্যাতলে গেছে। গাঁদা ফুলের পাতা

চিবিয়ে নখে বেশ কয়েকবার দেয়া হয়েছে। লাভ হয় নি। বাঁ-পা আজ খানিকটা ফুলেছে। যন্ত্রণাও হচ্ছে প্রচণ্ড। মজিদ দু'হাতে বাঁ-পা চেপে ধরে মুখ কুঁচকে বুড়ো আঙুলের নখটার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এই সময় আলম বাইরের গেট থেকে ডাকল,

এই মজিদ!

মজিদ মুখ না তুলেই বলল, রেতভি য়আ (অর্থাৎ ভেতরে আয়)। আলম বলল, কী করছিস ? মজিদ বলল, দেখছিস না কী করছি ? পা ধরে বসে আছি। একই বলে কপাল। নিজের পা নিজেকে ধরতে হয়।

আলম বলল, তোর পায়ে কী হয়েছে ?

ছুকি না (কিছু না)।

চল বের হই।

বিনা বাক্য ব্যয়ে মজিদ উঠে দাঁড়াল। আলম তার অনেক দিনের বন্ধু। স্কুলে তারা এক সঙ্গে পড়েছে। তারা যখন রাস্তায় নামল ঠিক তখন ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের একটি ডিসি-১০ ঢাকার আকাশে চক্কর দিচ্ছে। নামবার জন্যে ট্রাফিক কনট্রোলের অনুমতি চাচ্ছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার আকাশের জোছনা ফিকে হয়ে আসছে। অতি দ্রুত মেঘ জমছে। আশ্বিন মাসে মাঝে মাঝে এ রকম হয়। অতি দ্রুত ঝড় এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এই ঝড়ের সঙ্গে কালবোশেখির কিছুটা মিল আছে।

দুই বন্ধু রাস্তায় হাঁটছে। মজিদ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, লাশা।

আলম বিরক্ত গলায় বলল, উল্টো করে কথা বলিস নাতো চড় খাবি।

আচ্ছা আর বলব না। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে— তুই আমাকে কোলে নিয়ে নে। অনেকদিন কারো কোলে উঠি না।

আলম হো হো করে হেসে উঠল।

মজিদও হাসছে।

দুই বন্ধু হাসাহাসি করে খানিকটা এগিয়ে যাক আমরা এই ফাঁকে ডি.সি-১০ বিমানের ভেতর থেকে একটু ঘুরে আসি। বিমানের একজন যাত্রীর সঙ্গে গল্পের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। যাত্রীর নাম মীর্জা করিম। এই গল্পে আমরা তাঁকে মীর্জা সাহেব বলব।

৩

মীর্জা সাহেব কোমল গলায় ডাকলেন, এই পলিন, এই! পলিনের ঘুম ভাঙল না। ঘুমের মধ্যেই বড় করে নিঃশ্বাস নিল। একটু যেন চমকাল। শীতের রাতে গায়ের উপর থেকে লেপ সরে গেলে যেভাবে শিশুরা চমকে উঠে আবার নিথর হয়ে যায় ঠিক সে রকম।

পলিন মা, আমরা এসে গেছি।

এয়ার হোস্টেস ঢাকা শহরের তাপমাত্রা বলছে, বায়ুর আর্দ্রতা বলছে। টেম্পারেচার

টুয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস, হিউমিডিটি সিক্সটি ওয়ান পারসেন্ট, ক্লাউডি স্কাই। ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের প্লেন, ইংরেজ এয়ার হোস্টেস অথচ কথা বলছে বাঙালি উচ্চারণে। এই উচ্চারণের আরেকটি নাম আছে 'ইণ্ডিয়ান একসেন্ট ইংলিশ।'

পলিন মা, আমাদের নামতে হবে তো।

পলিন চোখ মেলল। এদিক-ওদিক তাকাল। ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে তাকে একটু যেন লজ্জিত মনে হচ্ছে। সে নিচু গলায় বলল, এটাই কি বাংলাদেশ ?

হুঁ।

এখন থেকে বাংলায় কথা 'চলতে' হবে ?

চলতে হবে না মা— চালাতে হবে। কিংবা বলতে হবে। চলতে শব্দটা এখানে হবে না।

পলিন মিষ্টি করে হাসল। মীর্জা সাহেব তার সীট-বেল্ট খুলে দিচ্ছেন। তাঁর মোটা-মোটা আঙুল সীট-বেল্ট খুলতে গিয়ে কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। দেখতে এত ভাল লাগছে।

তোমার শরীরটা কি এখন ভাল লাগছে মা ?

হুঁ।

জ্বর নেই তো ?

না। ক'টা বাজে ?

বুঝতে পারছি না। সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটা হবে।

তিনি পলিনের কপালে হাত রাখলেন, গা ঠাণ্ডা। নাকের কাছটা ঘামছে— জ্বর নেমে গেছে। প্লেনের দরজা খোলা হয়েছে। দরজার পাশে প্রচণ্ড ভিড়, যেন সবাই ঠিক করেছে এক সঙ্গে নামবে। পলিন বলল, আমরা সবার শেষে পড়লাম বাবা।

তাইতো দেখছি।

শেষ নামাই ভাল।

কেন ভাল ?

এম্নি বললাম। মনে হলো তাই বললাম।

পলিন ইংরেজিতে কথা বলছে। বাংলায় ভুল ধরিয়ে দেয়ায় এটা হয়েছে। লজ্জা পেয়েছে। দীর্ঘ সময় এখন সে ইংরেজিতে কথা বলবে। তারপর হঠাৎ এক সময় বাংলায় কথা শুরু করবে। ছোট ছোট বাক্য। ক্রিয়াপদগুলি মাঝে-মাঝে এলোমেলো হয়ে যাবে। বিশেষণপদগুলি ঠিক মত বসবে না অথচ শুনতে অপূর্ব লাগবে। বাংলা ভাষাটাই হয়ত এরকম যে এলোমেলো করে বললে ভাল লাগে। গতবছর মিনেসোটা থেকে বাল্টিমোর যাবার পথে গাড়ির চাকা পাংচার হলো। তিনি জ্যাক লাগিয়ে গাড়ি উঁচু করছেন। পলিন বসে আছে তার পাশে। অন্ধকারে কাজ করতে হচ্ছে। ইমার্জেন্সি লাইট কাজ করছে না। পলিন হঠাৎ বলল, আজ বিশেষ অন্ধকার— তাই না বাবা ?

মীর্জা সাহেব বললেন, বিশেষ অন্ধকার কথাটা ঠিক হবে না মা। খুব অন্ধকার বা গাঢ় অন্ধকার বলতে পারো।

পলিন লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, তাহলে বিশেষটা কখন বলব ?

মীর্জা সাহেব তার উত্তর দিতে পারেন নি। গাড়ি চালু হবার পর তিনি সারাপথ ভাবলেন, কিন্তু 'বিশেষ' শব্দটি দিয়ে একটি বাক্যও মনে পড়ল না। দীর্ঘদিন বাংলা ভাষার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কে জানে এক সময় হয়তো তাঁর নিজের বাংলাও এলোমেলো হয়ে যাবে।

প্লেন ফাঁকা হয়ে গেছে। হুইল চেয়ারে করে এক বুড়িকে নামান হচ্ছে। এই অথর্ব ব্রিটিশ বৃদ্ধা হুইল চেয়ারে করে বাংলাদেশে এসেছেন কেন কে জানে ?

মীর্জা সাহেব মেয়ের হাত ধরে এগুচ্ছেন। দরোজা পর্যন্ত যাবার পর মনে মনে বললেন, আমার মনটা আজ 'বিশেষ' ভাল নেই। এই এক যন্ত্রণা হয়েছে, কারণে অকারণে 'বিশেষ' শব্দটি ব্যবহার করে বাক্যরচনা করেন অথচ প্রয়োজনের সময় একটি সাধারণ বাক্যও মনে আসে নি। মিনেসোটা থেকে বাল্টিমোরের দীর্ঘ পথ তাঁকে বিষণ্ণ থাকতে হয়েছে।

আকাশ মেঘলা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাংলাদেশের আকাশ কি এই সময় মেঘলা থাকে ? আজ অক্টোবর মাসের সতের তারিখ। বাংলা মাসটা কী কে জানে। ইংরেজি মাস দিয়ে কিছু বোঝা যায় না। বাংলা মাস মানেই ছবির মত দৃশ্য। শ্রাবণ— টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কচুগাছের রঙ কোমল সবুজ। এখানে ওখানে পানি জমে আছে। আকাশ ধূসর বর্ণ। চৈত্র মাস— ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ, আকাশ ঘন নীল, চোখের দৃষ্টি পিছলে যাবার মত স্বচ্ছ, আকাশে চিল উড়ছে।

শরীরটা কি এখন ভাল লাগছে মা ?

হ্যাঁ ভাল। ঐ বুড়ো মহিলা বাংলাদেশে কেন এসেছেন বাবা ?

জানি না তো। হয়ত ট্যুরিস্ট। শেষ বয়সে পৃথিবী দেখতে বের হয়েছে। পয়সাওয়ালারা তাই করে।

আমার কাছে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। ট্যুরিস্টরা নতুন দেশে এলে খুব আগ্রহ নিয়ে চারদিকে তাকায়— বুড়ি কেমন ঝিম ধরে আছে।

হয়তো শরীরটা ভাল লাগছে না।

আমি কি উনাকে জিজ্ঞেস করব ?

সেটা কি মা ঠিক হবে ? উনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো উনি হয়ত পছন্দ করবেন না।

উল্টোটাও তো হতে পারে। উনি হয়ত খুশিই হবেন। আগ্রহ করে জবাব দেবেন।

বেশ ত যাও— জিজ্ঞেস করে আস।

পলিন গেল না। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। এয়ারপোর্টের মূল ভবন পঞ্চাশগজের মত দূরে। হেঁটেই যাওয়া যায় কিন্তু সবাই অপেক্ষা করছে ট্রানজিট বাসের জন্যে। হুইল

চেয়ারে বসা বুড়ি পানির একটা বোতল খোলার চেষ্টা করছে। বুড়ির একটা হাত সম্ভবত অচল। সে বোতলটা বাঁ হাতে খোলার চেষ্টা করছে। হুইল চেয়ারের পেছনে একজন অল্পবয়স্ক এয়ার হোস্টেস। সে দৃশ্যটি দেখছে কিন্তু সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসছে না।

বাবা!

কী মা ?

উনি পানির বোতলটা খুলতে পারছেন না।

তাইত দেখছি।

সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কেউ সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসছে না।

সাধারণত অথর্ব বুড়ো-বুড়িরা খুব খিটখিটে মেজাজের হয়। কেউ সাহায্য করতে গেলে রেগে যায়।

তবু ভদ্রতা করে হলেও কারো উচিত সাহায্য করতে যাওয়া। আমি কি যাব ?

তোমার ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই যাবে।

পলিনের যেতে হল না। বুড়ি পানির বোতলের মুখ খুলে ফেলেছে। এক ঢোক পানি খেয়েই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বোতলের মুখ লাগানোর জন্যে। ট্রানজিট বাস এসে পড়েছে। পলিন এগিয়ে গেল বুড়ির দিকে। ছোট্ট করে বাউ করে বলল, গুড আফটারনুন ম্যাডাম।

বুড়ি ছলছলে ঘোলা চোখে তাকাল— কোনো উত্তর দিল না। পলিন জবাবের জন্যে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। কোনো জবাব নেই। পলিনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পলিনের বয়স তের। তের বছরের বালিকারা অল্পতেই আহত হয়।

মীর্জা সাহেব ঘটনাটা লক্ষ করলেন কিন্তু তিনি যে লক্ষ করেছেন তা পলিনকে জানতে দিলেন না। রাগে তাঁর শরীর জ্বলছে। তাঁর নিজের দেশে, তাঁর মেয়েকে অপমান করার অধিকার এই বিদেশিনী বৃদ্ধার নেই। কিন্তু এটা কি তাঁর নিজের দেশ ? তাঁর পকেটে আমেরিকান নীলরঙ পাসপোর্ট। এই পাসপোর্ট হাতে পাবার আগে কোর্টে দাঁড়িয়ে বলতে হয়েছে— মহান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান মেনে চলব... মাতৃভূমির মর্যাদা... মেয়েকে তিনি তাঁর দেশ দেখাতে এনেছেন। যে সাতটা দিন তিনি এখানে থাকবেন— তিনি চান না এই সাতদিনে কেউ তাঁর মেয়ের মনে আঘাত করার মত কিছু করে। কারণ সামান্য মন খারাপ হলে পলিন অনেক দিন পর্যন্ত বিষণ্ণ থাকে।

ইমিগ্রেশনে মনে হচ্ছে অনেক সময় লাগবে। প্রচণ্ড ভিড়। তিনি শুনে এসেছিলেন বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন নাকি খুব ঝামেলা করে। বাস্তবে সেরকম দেখছেন না। ছেলেগুলি ভদ্র ব্যবহার করছে। একজন এক ডজন পণ্ডস ক্রীম নিয়ে এসেছে। তাকে ইমিগ্রেশনের বাচ্চামতো ছেলেটি বলল, এই ক্রীম তো দেশেই তৈরি হচ্ছে। এতোগুলি আনলেন কেন ? আর এটা কি নাইলনের দড়ি ? ব্যাগু আইটেম। এইসব আজেবাজে জিনিস দিয়ে স্যুটকেস ভর্তি করেছেন। ব্যাপার কী ভাই ?

উত্তরে লোকটি বোকার মত দাঁত বের করে হাসছে। ছেলেটি স্যুটকেসে চক দিয়ে

সাইন করে বলল, যান। মীর্জা সাহেব মুগ্ধ হলেন। কী সব ভয়ঙ্কর গল্পই না প্রচলিত। এরা নাকি জাঙ্গিয়া পরিয়ে উঠবোস করায়। কসমেটিকস অর্ধেক রেখে দেয়। নিচু গলায় বলে, কিছু ডলার ছেড়ে দিন।

এইসব গল্প বাঙালিদের কাছ থেকেই শোনা। প্রথম প্রথম আমেরিকায় আসার পর বাঙালিরা নিজের দেশ সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা উগরে দেয়। ভয়াবহ একটি ছবি আঁকে। মনে হয় সেটা জঙ্গলে একটা দেশ। যে দেশের সব মানুষ ফাঁকিবাজ। যে দেশে কিছুই পাওয়া যায় না। ঘুষ খাওয়ার জন্যে সবাই হা করে থাকে। রাত আটটার পর রাস্তায় বের হওয়া যায় না।

গল্পগুলি এমনভাবে করা হয় যাতে মনে হয় দেশটা বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে গেলেই তারা সবচে' খুশি হবেন।

এরা কেন এরকম করে ? অপরাধ বোধের কারণে ? দেশ ছেড়ে চলে এসেছে— সেই গ্লানি জমে আছে মনে। গ্লানি আড়াল করবার জন্যেই নিশ্চয় বলা। নিজেকেই সে বোঝায়।

ম্যাডাম, আপনার পাসপোর্ট ?

পলিন হেসে ফেলল। আনন্দ ঝলমলে গলায় পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমাকে ম্যাডাম বলছেন কেন ? আমার বয়স তের। মীর্জা সাহেব লক্ষ করলেন, মেয়ের বিষণ্ন ভাব কেটে গেছে। কী চমৎকার বয়স। মেঘ ও রৌদ্র অনবরত খেলা করে। এই অন্ধকার এই আলো। পলিনের মনে বিদেশিনীর স্মৃতি এখন আর নিশ্চয়ই নেই। মীর্জা সাহেব কাস্টমস-এর এই যুবকটির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। একটা কিছু উপহার এই ছেলেটিকে দিতে ইচ্ছে করছে। সেটা সম্ভব নয়।

আপনাদের আমেরিকান পাসপোর্ট ?

জ্বি।

অনেকদিন পর দেশে ফিরছেন ?

জ্বি। প্রায় একুশ বছর পর।

ডিক্লেয়ার করার মতো কিছু কী আছে ?

জ্বি না।

মীর্জা সাহেব তাঁর স্যুটকেস খুললেন। ছেলেটি স্যুটকেসের দিকে না তাকিয়েই বলল, একুশ বছরে সব বদলে গেছে। কিছু চিনতে পারবেন না।

মীর্জা সাহেব বললেন, আমি নিজে কিছু দেখতে আসিনি মেয়েকে দেশ দেখাতে এনেছি। মেয়ের নাম পলিন। মীর্জা সাহেব দু'টি ভুল কথা বললেন। তিনি মেয়েকে দেশ দেখাতে আনেন নি। নিজেই দেখতে এসেছেন। মেয়ের নাম 'পলিন' নয়। নাম 'পোওলেন'। তার মায়ের রাখা নাম। তিনি পলিন করে নিয়েছেন। নামটাকে বাঙালি করা হয়েছে। ই-কার যুক্ত শব্দগুলি কেন জানি বাংলা-বাংলা মনে হয়।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। টেম্পারেচার হঠাৎ খানিকটা নেমে গেছে। আশেপাশে শিলা বৃষ্টি হলে হঠাৎ করে ঠাণ্ডা পড়ে। পলিন অল্প অল্প কাঁপছে। মীর্জা সহেব ট্যাক্সির কাচ উঠিয়ে দিলেন। পলিন বলল, কাচ নামানো থাকুক দেখতে দেখতে যাই।

তোমার তো ঠাণ্ডা লাগছে। শীতে কাঁপছো।

তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না।

দেশটা কেমন লাগছে মা ?

ভাল। তবে তুমি যে বলেছিলে খুব সবুজ। তেমন সবুজ তো না।

বৃষ্টি হচ্ছেতো তাই বুঝতে পারছ না।

মীর্জা সাহেব ট্যাক্সি ড্রাইবারকে জিজ্ঞেস করলেন, এই রাস্তাটি কি নতুন করা হয়েছে ?

ট্যাক্সি ড্রাইভার মাথা না ঘুরিয়ে বলল, না।

পৃথিবীর সব দেশের ড্রাইভাররা কথা বলতে ভালোবাসে। একটা প্রশ্ন করলে হড়বড় করে একগাদা কথা বলে। এই ড্রাইভার সে রকম নয়। সমস্ত পৃথিবীর উপর সে বিরক্ত বলে মনে হচ্ছে। গাড়ি চালাচ্ছে খুব দ্রুত। বিপজ্জনক কয়েকটা ওভারটেক করল। বৃষ্টি-ভেজা পিচ্ছিল রাস্তায় সে যা করছে তা ঠিক না। কিন্তু লোকটা ওভারটেক করে মজা পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এটিই হয়ত তার জীবনের একমাত্র আনন্দ। পৃথিবীর সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা প্রতীকী ব্যাপার আছে।

বাবা

কী মা ?

ঐ ব্রিটিশ মহিলা আমার কথার জবাব দিলেন না কেন ?

তিনি হয়তো তোমার কথা শুনতে পান নি।

আমারও তাই মনে হয়।

পলিন চোখ বন্ধ করে গা এলিয়ে পড়ে আছে। নতুন দেশ। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখার কথা। পলিন দেখছে না। তার কি ভাল লাগছে না ? মীর্জা সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল।

ট্যাক্সি একটা বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেল। ড্রাইভার বলল, জিয়ার আমলে করা।

মীর্জা সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দীর্ঘ সময় পর ড্রাইভার প্রশ্নের জবাব দিল। এতোক্ষণ কি সে এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবছিল ? মনে করতে পারছিল না— কার আমলে রাস্তা হয়েছে ? হয়তোবা।

পলিন চুপচাপ আছে। চোখ বন্ধ। ঘুমুচ্ছে হয়তো। জ্বর আসেনিতো ? তিনি পলিনের গায়ে হাত দিলেন। গা গরম লাগছে। বেশ গরম।

মেয়েটির এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। 'ফার্গস ফল্স' এলাকা থেকে বেরুলেই শরীর খারাপ। যতোক্ষণ সে ফার্গস ফল্স-এ আছে ততক্ষণ ভাল। স্কুলে যাচ্ছে, খেলছে, পড়াশোনা করছে, শহরের গণ্ডি পেরুলেই জ্বর।

মীর্জা সাহেব একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বলেছেন। সাইকিয়াট্রিস্ট একগাদা থিওরি কপচিয়েছেন। সেই সব থিওরির মূল কথা হচ্ছে— পলিন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। নিজের বাড়ির কাছাকাছি যখন থাকে তখন এটা কম থাকে। বাইরে গেলেই বেড়ে যায়। ব্রোকেন ফ্যামিলীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে এটা খুব দেখা যায়। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন,

অনেক ব্রোকেন ফ্যামিলীর ছেলেমেয়েদের আমি দেখেছি। তাদের কারোর মধ্যে এই ব্যাপার কিন্তু দেখি না।

স্যার আসছি। নামেন।

মীর্জা সাহেব ড্রাইভারের এই কথায় খুব অপ্রস্তুত বোধ করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হোটেলের গাড়ি বারান্দায় ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোলা। রাজা-বাদশাদের মতো জমকালো পোশাক পরা হোটেলের দারোয়ান অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তিনি এবং তাঁর কন্যা— দু'জনই গভীর ঘুমে।

বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারায়। বাতাসও দিচ্ছে। এত অল্প সময়ে আবহাওয়ার একী পরিবর্তন! হোটেলের ভেতর ঢুকতেই সব আবার অন্য রকম হয়ে গেল। কে বলবে বাইরে এমন দুর্যোগ ?

ফাইভ স্টার হোটেলগুলির একটা মজা আছে। দেশের সঙ্গে এদের কোনো যোগ থাকে না। সব একরকম। হোটেলগুলিই যেন আলাদা একটা জগৎ। বাংলাদেশের একটা হোটেলের ভেতরটায় যে গন্ধ ভেসে বেড়ায় সেই একই গন্ধ পাওয়া যায় লসএঞ্জেলস-এর হোটেলে। রিসিপশনিস্টরা মাছের মতো ভাবলেশহীন চোখে ধাতব গলায় কথা বলে। সব মানুষের ভেতরই একজন রোবট থাকে। বড় হোটেলগুলি সেই সব রোবটদের বের করে নিয়ে আসে।

স্যার আপনাদের কি রিজার্ভেশন আছে ?

হ্যাঁ আছে।

আপনাদের পাসপোর্টগুলি কি দেখতে পারি ?

অবশ্যই পারেন। তার আগে দয়া করে একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে পারবেন ? আমার মেয়েটি অসুস্থ।

আপনারা ঘরে চলে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার যাবেন। রুম নাম্বার দু'শ এগার।

ধন্যবাদ।

হোটেলের রুমে ঢুকে প্রথম যে জিনিসটা দেখতে ইচ্ছা করে সেটা হচ্ছে— বাথরুম। বাথরুম দেখা হবার পর ইচ্ছা করে জানালার পর্দা সরিয়ে শহর দেখতে। মীর্জা সাহেব প্রথমটা করলেন না তবে জানালার পর্দা সরিয়ে শহর দেখতে চেষ্টা করলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না। গোটা শহর ঘন অন্ধকারে ঢাকা। এই হোটেলে নিশ্চয়ই নিজেদের পাওয়ার জেনারেটার আছে।

বাইরে হাওয়ার মাতামাতির কিছুই এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। এয়ারকুলারের শব্দে ঢাকা পড়েছে। এয়ারকুলার বন্ধ করে জানালার একটা পাট কি খুলে ফেলা যায় ?

হোটেলের ডাক্তার বিদেশী। চেহারা দেখে মনে হয় হংকং বা থাইল্যান্ডের কেউ হবেন। এরা কি বাংলাদেশী কোনো ডাক্তার খুঁজে পায় নি ?

ডাক্তার সাহেব ঔষুধপত্র কিছুই দিলেন না। গরম স্যুপ খেয়ে পলিনকে ঘুমিয়ে পড়তে বললেন। ডাক্তারের ধারণা ভ্রমণের ক্লান্তিতে এমন হয়েছে। বিশ্রাম নিলেই সেড়ে যাবে।

ডাবল রুম।

পাশের খাটে পলিন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। গলা পর্যন্ত চাদর টানা। ধবধবে সাদা রঙের চাদর। সাদা চাদরে ঢাকা একটি বালিকার মুখ দেখতে ভাল লাগে না। সাদা চাদরের সঙ্গে কোথায় যেন মৃত্যুর সম্পর্ক আছে। সাদা কফিনের দীর্ঘ সংস্কার কাটান মুশকিল। মীর্জা সাহেব খুব সাবধানে নীলরঙা একটা উলের চাদর মেয়েটির গায়ে দিয়ে দিলেন। ঘুমের মধ্যেই পলিন একটু যেন চমকাল।

ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে। রাত এগারোটা-পাঁচ। রাস্তায় নামলেই বাংলাদেশ দেখা যাবে। বাইশ বছরে কী হল দেশটার বোঝা যাবে। তাতে তাঁর কিছু কী আসে যায় ? না আসে যায় না। কিছুই আসে যায় না।

মীর্জা সাহেব রুম সার্ভিসকে খবর দিয়ে একটা স্যাণ্ডউইচ এবং গরম এক কাপ কফি খেয়ে শুয়ে পড়লেন। কফি খেলে বেশির ভাগ লোকই ঘুমুতে পারে না। তাঁর ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়। ঝিমুনি আসে। ঘুমুতে ইচ্ছা করে।

কফি খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেই হল। আজও যে সে রকম হবে তেমন কথা নাই। জেট লেগ হয়েছে। শরীরের নির্দিষ্ট ঘুমের সাইকেলে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে হয়ত জেগে থাকতে হবে।

তাঁর একটু শীত শীত লাগছে। আরামদায়ক শীত যা ঘুম নিয়ে আসে। গায়ের উপর চাদর টেনে বাতি নিভিয়ে দিলেন। বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম কেটে গেল। মাথা দপদপ করতে লাগল। ইনসমনিয়ার পূর্ব-লক্ষণ। এখন তৃষ্ণা পাবে। পানি খাবার সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে যেতে হবে। আবার তৃষ্ণা পাবে। আবার পানি। আবার বাথরুম। তিনি বাতি জ্বালাতেই পলিন বলল, বাবা।

ঘুম ভেঙে গেছে ?

হুঁ।

শরীর কেমন ?

শরীর ভাল। ক্ষিধে পেয়েছে বাবা।

ক্ষিধে পেলে বুঝতেই হবে শরীর ভাল। কী খাবে ? স্যাণ্ডউইচ ছাড়া তো আর কিছু পাওয়া যাবে না।

স্যাণ্ডউইচ ছাড়া আর যাই পাওয়া যায় তাই খাব।

রুম সার্ভিসকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

আমেরিকায় এখন ক'টা বাজে বাবা ?

ঠিক বলতে পারছি না— সকাল আটটা/নটা হবে। মা'র সঙ্গে কি কথা বলতে ইচ্ছা করছে ?

পলিন হ্যাঁ না কিছুই বলল না। মীর্জা সাহেব বললেন, দাঁড়াও একটু খোঁজ করছি, ডিরেক্ট ডায়ালিং কি-না তাও তো জানি না।

জানা গেল ডিরেক্ট ডায়ালিং। দ্বিতীয় বার ডায়াল ঘুরাবামাত্র পাওয়া গেল। মীর্জা সাহেব মেয়েকে কথা বলার সুযোগ দেবার জন্যে বাইরে চলে গেলেন। বলে গেলেন সিগারেট শেষ হয়ে গেছে মা সিগারেট কেনার জন্যে যাচ্ছি।

পলিন কোমল গলায় বলল, কেমন আছ মা ?

পলিনের মা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমি কেমন আছি তা মোটেই জরুরি নয়। তুমি কেমন আছ ?

ভাল।

ভাল থাকার তো কথা না। নিশ্চয়ই শরীর খারাপ করেছে। ঘর থেকে বেরুলেই তোমার শরীর খারাপ করে। সব জেনে শুনেও তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে এতো দূর গিয়েছে। যতোই দিন যাচ্ছে ততোই দেখি মানুষটা মূর্খ হচ্ছে।

আমি ভাল আছি মা।

বাজে কথা বলবে না। আমি তোমার গলা শুনেই বুঝতে পারছি। তোমার শরীল ভাল না। বল সত্যি করে— জ্বর আসে নি।

এসেছিল। এখন ভাল।

তুমি ফিরে আসামাত্র আমি যা করব তা হচ্ছে তোমাকে আমার কাস্টডিতে নিয়ে আসা। পিটার খুবই বদমেজাজি কিন্তু সে তোমার বাবার মতো অবিবেচক নয়। অভিভাবক হিসেবে তোমার বাবার চেয়ে সে ভাল হবে।

আমি বাবার সঙ্গেই ভাল আছি।

তুমি মোটেও ভাল নেই। এইত কাশির শব্দ শুনছি। তোমার কি কাশিও হয়েছে ?

মীর্জা সাহেব সিগারেটের জন্যে যাননি। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হোটেলটার একুয়াস্টিকস ভাল। দরজা সামান্য খোলা তবুও কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তিনি হোটেলের লবিতে নেমে এলেন।

পকেটে সিগারেট নেই। এক প্যাকেট সিগারেট পেলে ভাল হত। এখানে ভেণ্ডিং মেশিন জাতীয় কিছু নেই। বারে নিশ্চয়ই সিগারেট পাওয়া যাবে। বার কোথায় কে জানে ? কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না।

লবি থেকে সদর দরজা ঠেলে তিনি হোটেলের বাইরে পা রাখলেন। দারোয়ান যথারীতি স্যালুট দিল।

আশেপাশে ছোটখাট দোকানপাট আছে ? যেখানে পান-সিগারেট বিক্রি হয়।

সিগারেট হোটেলে পাবেন স্যার।

পান ? পান নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না ?

জ্বি না।

দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।

ট্যাক্সি ডেকে দিব।

না ট্যাক্সি লাগবে না।

সন্ধ্যায় যে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ পরিষ্কার। ঝকঝকে চাঁদ উঠেছে। ভেজা রাস্তার এখানে-ওখানে পানি জমে আছে। পানিতে চাঁদের ছবি। চমৎকার দৃশ্য। তাঁর মনে হল এক শহরের চাঁদের সঙ্গে অন্য শহরের চাঁদের কিচ্ছু মিল নেই।

হাঁটতে চমৎকার লাগছে। রাস্তা ফাঁকা। মাঝে মাঝে দ্রুত গতিতে কিছু গাড়ি যাওয়া-আসা করছে। রাত বারোটা এখনো বাজেনি। ঝড়বৃষ্টি হবার কারণেই হয়তো রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। রাস্তাঘাট একই সঙ্গে পরিচিত এবং অপরিচিত লাগছে। একবার মনে হচ্ছে তিনি নিতান্তই অচেনা একটা শহরে আছেন। পর মুহূর্তেই মনে হল তাঁর সারাজীবন এই শহরেই কেটেছে।

তিনি গুনগুন করে গানের কিছু কলি বলছেন। যার প্রথম লাইন—

প্রজাপতি প্রজাপতি রে।...

৪

স্টেডিয়ামের যে রেস্টুরেন্টে আলম এবং মজিদ বসে আছে সেখানেও আলো নেই। ক্যাশিয়ারের টেবিলে একটি মাত্র ইমার্জেন্সি বাতি জ্বলছে। আর একটি মোমবাতি জ্বলছে হাত ধোয়ার জায়গায়। বাইরের ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলেও ইলেকট্রিসিটি এখনো আসে নি। রেস্টুরেন্টের সামান্য আলোতেও খাওয়া দাওয়া চলছে। মজিদ দু'প্লেট বিরিয়ানি এবং ঠাণ্ডা পেপসির অর্ডার দিয়েছে। আলম বলল, টাকা কোথায় পেলি ?

মজিদ গম্ভীর গলায় বলল, রিচু করেছি।

রিচু করেছিস মানে ?

চুরি করেছি। ফুপার একটা আটার বস্তা বেচে দিয়েছি।

বলিস কী।

চিনির বস্তা মনে করে ঝেড়ে দিয়েছিলাম, অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারি নি। শেষে দেখি শালা আটার বস্তা। গ্রেট লস।

ধরতে পারে নি।

পারবে না কেন ? ধরেছে।

আলম চিন্তিত মুখে বলল, তোকে কিছু বলল না ?

না। কোলে নিয়ে আদর করেছে। গালে চুমু খেয়েছে।

তাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই ইলেকট্রিসিটি চলে এল। মজিদ বিরিয়ানির সঙ্গে রেজালার অর্ডার দিল।

আলম বলল, তোর পায়ের ব্যথাটা কি কমেছে ?

মজিদ বলল, ছেমেক, ছেমেক।

আবার উল্টো করে বলছিস, শালা চড় খাবি কিন্তু।

মজিদ ভুরু কুঁচকে ফেলেছে— হঠাৎ চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে।

আলম বলল, এই এরকম করছিস কেন ?

কী রকম করছি ?

মুখ টুখ কুঁচকে আছিস। ব্যথা হচ্ছে ?

হুঁ।

ডাক্তার টাক্তার দেখানো দরকার। সেপটিক ফেকটিক হয়ে গেছে কিনা কে জানে।

মজিদ বিরক্ত স্বরে বলল, খাওয়া শুরু কর। বিরিয়ানি খেতে হয় গরম গরম। এই যে ভাইয়া, ঝাল দেখে কাঁচা মরিচ দিতে পারেন ? কী কাঁচা মরিচ দিয়েছেন খেতে মিষ্টি আলুর মত লাগছে।

তারা সেক্রেটারিয়েটের সামনে দিয়ে প্রেস ক্লাবের দিকে এগুচ্ছে। দু'জনের হাতে দু'টা সিগারেট। মজিদ সিগারেট খায় না। এককেটা টান দিচ্ছে আর খুকখুক করছে। প্রোটিন হাউজ পার হয়ে তারা চায়নিজ রেস্টুরেন্টের কাছাকাছি চলে এল। আর তখন আলম খুশি খুশি গলায় বলল, মাহিন শালাকে পাওয়া গেছে। শালার কারবারটা দেখ না।

মাহিন অদ্ভুত কিছুই করছে না। একটা সেলুনে চুল কাটাচ্ছে। চুল কাটানো হয়ে গেছে নাপিত এখন মাথা মালিশ করছে। আরামে মাহিনের চোখ বন্ধ হয়ে আছে।

মজিদ বলল, শালা রাত দুপুরে চুল কাটাচ্ছে ব্যাপারটা কী ? চলতো চুপি চুপি গিয়ে শালার গালে ঠাস করে একটা চড় মারি, দেখি শালা কী বলে।

আলম বলল, কিছুই বলবে না। টাকা ধার চাইবে।

মাহিনের সম্প্রতি এই রোগ হয়েছে বন্ধু বান্ধব কারোর সঙ্গে দেখা হলেই চোখ মুখ করুণ করে টাকা ধার চাইবে। অথচ তাদের বন্ধু মহলে মাহিনের অবস্থাটা সবচে' ভাল। তার বাবা পুলিশের রিটায়ার্ড ডি.এস.পি। মাহিনের বড় দুই ভাইয়ের একজন কাস্টমস ইন্সপেক্টর, অন্যজন জগন্নাথ কলেজের ইকনমিক্সের প্রফেসর। ভাই-বোন সবার মধ্যে মাহিন ছোট। আলমের সঙ্গে সে এম.এ. পাশ করেছে। এখনো চাকরি বাকরি কিছু হয় নি। অস্ট্রেলিয়া চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কী একটা লাইন না-কি পাওয়া গেছে। লাইনটা কী তা সে ভেঙ্গে বলছে না।

মাহিনের স্বাস্থ্য চমৎকার, চেহারা তারচেয়েও চমৎকার। দারুণ আড্ডাবাজ। একটাই দোষ সে হাড়কেপ্পন। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সে কাউকে এক কাপ চা কিনে খাওয়ায় নি এ রকম একটা গুজব প্রচলিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটা সে পার করে দিয়েছে অন্যের উপর দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নববর্ষে ছাত্রদের নামের টাইটালে সে যে সব নাম পেয়েছে সেগুলি হচ্ছে— রক্তচোষা, চিনেজোক, পরগাছা, দি বেগার।

আলম এবং মজিদ নাপিতের দোকানে ঢুকে পড়ল। মাহিন চোখ মেলে দেখল। তার মুখের ভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হল না। সে গম্ভীর গলায় বলল, দোস্ত দশটা টাকা দিতে

পারবি ? দশটা টাকা হলে মাথাটা শ্যাম্পু করিয়ে ফেলি। বাড়িতে গিয়ে তাহলে আর গোসলের ঝামেলা করতে হয় না।

আলম বলল, বাড়িতে যাওয়া-যাওয়ি নেই, তুই চল আমাদের সাথে।

কোথায় ?

রাস্তায় হাঁটব।

পাগল হলি না-কি ? আমি এর মধ্যে নেই, আমাকে দশ মিনিটের মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে। ভাইয়ের ব্যাটার জন্যে গ্রাইপ ওয়াটার নিয়ে যেতে হবে। ব্যাটা পেটের ব্যথায় পোঁ পোঁ করে কাঁদছে।

কাঁদুক। কাঁদলে হার্ট স্ট্রং হয়।

ভাবী আমাকে ছেঁচে ফেলবে। তোরা আছিস সুখে। তোদের ফ্যামিলীতে তো আর বড় ভাইয়ের স্ত্রী নেই। আমার কপালে দুই খান। একজন আবার ইংরেজির ছাত্রী। মিষ্টি সুরে ইংরেজিতে এমন কঠিন কঠিন কথা বলে যে...

মজিদ বলল, আমাদের সঙ্গে থাকলে কুড়ি টাকা পাবি রাজি আছিস কিনা বল।

একশ' টাকা দে— ভেবে দেখি। বিরাট ক্রাইসিস যাচ্ছে।

পঁচিশ পাবি, ভেবে দেখ। আছেই মুটে পঁচিশ।

তাহলে তোরা বস এখানে। গ্রাইপ ওয়াটারটা কিনে দিয়ে চলে আসব। দে টাকাটা দে।

পাগল, তোকে আমরা চিনি না— একবার গেলে তোর আর টিকির দেখা পাওয়া যাবে না।

মাহিনের মুখ বিমর্ষ হয়ে গেল।

বিমর্ষ ভাব দীর্ঘস্থায়ী হল না। রাস্তায় নেমেই তাঁর মধ্যে ফূর্তির ভাব দেখা গেল। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, সুপার একটা চাঁদমামা উঠেছে দেখেছিস ?

আলম বলল, আমরা দেখেছি, তুই দেখ।

কবির দল বোধহয় কাগজ কলম নিয়ে বসে গেছে। কী বলিস ?

জানি না।

মাহিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, মামা ভাগ্নেদের কথা মনে রেখ।

তারা এগিয়ে যাচ্ছে কাকরাইলের দিকে। মজিদের পায়ের ব্যথা এখন অনেক কম। এক স্যান্ডেল পায়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল বলে সে বাঁ পায়ের স্যান্ডেল খুলে ফেলে দিয়েছে। এক পায়ে স্যান্ডেল পরে সে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে। বন্ধুরা ব্যাপারটা দেখেও কেউ কিছু বলল না।

মজিদ বলল, মাহিন তোর অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার কী হল ?

হবে।

কখন হবে ?

ধর মেরে কেটে এক মাস। আগেও হতে পারে। ইমিগ্রেশন ভিসার জন্যে এপ্লাই করেছি।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবি ?

তুই ওখানে গিয়ে করবি কী ? শালা অশিক্ষিত মূর্খ।

ঐ দেশে সবাই মহাজ্ঞানী ?

মহাজ্ঞানী না হলেও তোর মত মূর্খ কেউ নেই— শালা তুই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলি না। তোর সঙ্গে হাঁটাওতো লজ্জার ব্যাপার।

মজিদ কিছু বলল না।

মাহিন সিগারেট ধরাল। তার প্যান্টের পকেটে ছ'টা সিগারেট। প্যাকেট সে বের করে নি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ম্যাজিসিয়ানদের মত একটা সিগারেট বের করে এনেছে। বন্ধু-বান্ধবদের সামনে সে কখনো প্যাকেট বের করে না। প্যাকেট বের করা মানে এক ধাক্কায় সব শেষ। যে খাবে না সেও হাত বাড়াবে।

মাহিন বলল, আমার কথায় রাগ করলি নাকি, এই শালা ?

না।

রাগ করেছিস। তোর মুখ দেখেই মনে হচ্ছে তুই রাগ করেছিস।

মজিদ বলল, রাগ করলে ক্ষুর দিয়ে তোর পেটটা ফাঁক করে দিতাম। বলতে বলতে মজিদ প্যান্টের পকেট থেকে চকচকে একটা ক্ষুর বের করল। খাপ থেকে খুলে চাঁদের আলোয় উঁচু করে ধরল। দলটা থমকে দাঁড়াল।

আলম বলল, তুই ক্ষুর পেলি কোথায় ?

আমার সাথেই থাকে।

সাথেই থাকে ? ফাজলামির জায়গা পাস না। তুই এটা নাপিতের দোকান থেকে গাপ করেছিস।

হুঁ।

তুইতো বিরাট চোর হয়ে গেছিস ব্যাটা।

হুঁ।

হুঁ হুঁ করছিস কেন ? ক্ষুর চুরি করলি কেন ?

দাড়ি কামাব। রোজ রোজ দাড়ি কামাবার পয়সা পাব কই ?

মাহিন বলল, দোস্ত ক্ষুরটা বন্ধ করে রাখ। ভয় ভয় লাগছে। মজিদ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুর খাপে ঢুকিয়ে পকেটে রেখে দিল। মাহিন বলল, তুই কিনা আমার উপর রেগে আছিস। আচ্ছা তোকে সত্যি কথাটা বলি, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটা বোগাস।

বোগাস ?

হুঁ। কোথাও কিছু হচ্ছে না বলতে লজ্জা লাগে— তাই অস্ট্রেলিয়ার কথা বলি।

মন্দ না।

আমার কথা শুনে অনেকের আবার হিংসাও হয়। খুব মজা লাগে। খুব অশান্তিতে আছিরে দোস্ত।

তোর আবার অশান্তি কী ?

আছে। বলে শেষ করা যাবে না। দুই রোজগারি ভাইয়ে ভাইয়ে লেগে গেছে— ধুন্ধুমার অবস্থা। দু'জনেই আলাদা বাসা করছে। আমাদের অবস্থা যে কী হবে অনলি গড নোজ।

তোর বাবারতো টাকা পয়সা আছে।

বাবার টাকা পয়সা কোত্থেকে আসবে ? তাঁর অনেস্ট বাতিক ছিল। ঘুষ নিতেন না। আসলে ভীরু টাইপের লোক ছিলেন। ঘুষ নিতে সাহস লাগে। সাহস ছিল না, বাইরে প্রচার করেছেন— অনেস্ট। পেনসনের টাকা পয়সা দিয়ে মিরপুরে জমি কিনেছেন। সেই জমির দখল পাচ্ছেন না। পুলিশের লোক হয়েও জমির দখল পাচ্ছেন না বুঝে দেখ অবস্থা। ঐ দিন দেখে এসেছি ঐ জমিতে তিনতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে একখানা বাড়ি তুলেছে। বিরাট সমস্যায় খাবি খাচ্ছি। বুঝলি।

তারা চুপচাপ হয়ে গেল। তিনজনেই নিঃশব্দে এগুচ্ছে। রাত এগারোটার মত বাজে। রাস্তা নির্জন। এই দিকে রিকশার চলাচল এম্নিতেই কম। আজ আরও কমে গেছে। মাঝে মাঝে হুম করে অতি দ্রুত এক আধটা প্রাইভেট কার চলে যাচ্ছে। আলম বলল, কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। ছিনতাই পার্টির হাতে পড়তে পারি।

মজিদ বলল, তোর আছে কী যে ছিনতাই পার্টির হাতে পড়বি ?

রিস্টওয়াচ আছে।

মজিদ বলল, সাথে ক্ষুর আছে আমরাই এখন ছিনতাই পার্টি। দাঁড়িয়ে দেখ এক্ষুণি একটা ছিনতাই করব।

পাগলামি করিস না মজিদ।

ছিনতাই না করলেও ভয় দেখিয়ে দেই। ভয় দেখাতেতো অসুবিধা নেই।

বাদ দে। বরং চল করিমের ওখানে তাস খেলব।

মজিদ বলল, দুনিয়ার এক নম্বর মজা কীসে হয় জানিস ? এক নম্বর মজা হল ভয় দেখানোয়। পৃথিবীর মানুষ সারাক্ষণ একজন আরেক জনকে ভয় দেখায় কেন ? মজা পায় বলেই ভয় দেখায়। ভয়ের মধ্যেই আসল মজা।

কাকরাইলের দিক থেকে হুডতোলা একটা রিকশা আসছে। আলম বা মাহিন কিছু বুঝবার আগেই মজিদ রাস্তায় নেমে তীব্র গলায় বলল, যায় কেডা ? থাম দেহি।

তার গলার স্বর সে কর্কশ করে ফেলেছে। পুরানো ঢাকার ছেলেপুলেদের মত ঢাকাইয়া স্বর বের করেছে। রিকশাওয়ালা হকচকিয়ে থেমে গেল।

মজিদ বলল, আতের মইদ্যে এইটা কী, ক দেহি ? এই জিনিসের নাম কী ?

চাঁদের আলোয় ক্ষুরের ফলা চকচক করতে লাগল। রিকশাওয়ালা বুড়ো। সে রিকশা থেকে নেমে গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে। শুরুতে একবার মাত্র মজিদের দিকে

তাকিয়েছিল, এখন আর তাকাচ্ছে না। মনে হয় এ রকম পরিস্থিতিতে এর আগে সে আর পড়ে নি।

পুরো ব্যাপারটাই এত আকস্মিক যে আলম এবং মাহিন হকচকিয়ে গিয়েছে। আলম ভীত স্বরে ডাকল, এই মজিদ এই। সেই স্বর এতই ক্ষীণ যে মজিদের কানে পৌছল না।

মজিদ হুংকার দিল, রিকশার ভিতরে কোন হালা ? মাতা বাইর কর। চান মুখখান দেহি।

রিকশার আরোহী দু'জন। মধ্য বয়স্ক একজন ভদ্রলোক সঙ্গে তার স্ত্রী। তার বয়স উনিশ কুড়ির বেশি হবে না। এই মেয়েটি ভয়ে ও আতংকে সাদা হয়ে গেছে। পুরুষটি নামতে চেষ্টা করতেই মেয়েটি সজোরে তার হাত আঁকড়ে ধরল। পুরুষটি বেশ বলশালী। পরনে স্ট্রাইপ দেয়া হাফ শার্ট। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা। সে ভয় পেলেও চেহারায় তা বোঝা যাচ্ছে না। সে মোটামুটি স্বাভাবিক গলায় বলল, ভাই আপনি কী চান ?

নামতে কইতাছি কথা কানে ঢুকে না ? নাকি ক্ষুর হান্দাইয়া দিমু ?

লোকটি স্ত্রীর সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে রিকশা থেকে নেমে পড়ল। নিচু গলায় বলল, টাকা বিশেষ কিছু আমাদের সঙ্গে নাই ভাই সাহেব। বলেই সে পকেটের মানিব্যাগ বের করল।

মজিদ খেকিয়ে উঠল, ট্যাকা পয়সা তোর কাছে চাইছিরে হারামি ? তুই মানিব্যাগ বাইর করলি কোন কামে ?

ভুল হয়ে গেছে কিছু মনে করবেন না।

আমার ওস্তাদ ঐখানে খাড়াইয়া আছে ওস্তাদরে সালাম দে।

লোকটি আলমের দিকে তাকিয়ে সালামের মত ভঙ্গি করল। মুখে বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

মজিদ বলল, ওস্তাদ পিস্তলডা বাইর করেন। এই হালা ফকিরের পুলা পিস্তল দেখবার চায়।

রিকশায় বসে থাকা মেয়েটি এইবার ফুঁপিয়ে উঠল। রিকশাওয়ালা অসহায়ভাবে একবার মেয়েটির দিকে একবার মজিদের দিকে তাকাচ্ছে। দূরে গাড়ির হেড লাইট দেখা গেল। লোকটি প্রবল আশা নিয়ে হেড লাইটের দিকে তাকাচ্ছে। গাড়ি কিন্তু থামল না। হুস করে বের হয়ে গেল। মজিদ বলল, রিকশার মইদ্যে ঐ মাইয়া কে ?

আমার স্ত্রী।

বিহা করা ইসতিরি ?

জ্বি।

লাইছেন আছে ? বিহার লাইছেন আছে ?

ভাই আমার সাথে তিনশ টাকা আছে এইটা নেন আর আমার স্ত্রীর একজোড়া কানের দুল আছে খুলে দিচ্ছি। এইগুলি নিয়ে আমাদের যেতে দিন ভাই— আমার এক আত্মীয়ের অসুখের খবর পেয়ে যাচ্ছি। নয়তো এত রাতে স্ত্রীকে নিয়ে বের হতাম না।

হারামি তুই কচ কী ? ট্যাকা পয়সা তোর কাছে চাইছি ? কানের দুল চাইছি ? ঐ হারামজাদা আমার একটা ইজ্জত নাই ?

ভাই, কী চান বলেন ?

তুই কানে ধর। কানে ধইরা মাফ চা।

জ্বি কী বললেন ?

কী কইলাম হুনস নাই— কানে ধর।

লোকটি কানে ধরল। রিকশায় বসে থাকা মেয়েটি ক্রমাগত ফুপাচ্ছে। রিকশাওয়ালা ক্ষীণ স্বরে বলল, শব্দ কইরেন না আম্মা, আল্লাহর নাম নেন।

হারামজাদা কানে ধরছস ?

জ্বি।

তুই কী করস ?

রেলওয়েতে চাকরি করি।

রেলওয়ের মইদ্যে সব চোরের আড্ডা। তুইও হালা চোর। শুনছস কী কইলাম ?

জ্বি।

আর চুরি করিস না।

জ্বি আচ্ছা।

যা অখন ভাগ।

লোকটি মজিদের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। এখনো কানে ধরে আছে।

কথা কানে ঢুকে না ? কী কইলাম তোরে ? বউ লইয়া ভাগ। অমন ছুন্দর বৌ লইয়া বাইর হবি না।

জ্বি আচ্ছা।

আমার দুই ওস্তাদরে সেলাম দে। সেলাম দিয়া ভাগ।

লোকটি স্পষ্ট স্বরে দু'বার বলল, স্লামালিকুম। তারপর রিকশায় উঠে বসল। রিকশায় উঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তার গায়ে এলিয়ে পড়ে গেল। বুড়ো রিকশাওয়ালা ঝড়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে রিকশা নিয়ে উড়ে গেল।

দীর্ঘ সময় তিন বন্ধু কোনো কথা বলল না। আলম এবং মাহিন দু'জনেই খুব ঘামছে। বুক ধড়ফড় করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

প্রথম কথা বলল মাহিন। প্রায় ফিসফিস করে বলল, শালা তুইতো ভেল্কি দেখিয়ে দিলি। এখনো আমার শরীর কাঁপছে।

মজিদ বলল, মজা পেয়েছিস কি-না বল ?

মজা, এর মধ্যে মজা কী ?

তুই বুকে হাত দিয়ে বলতো, তোর মজা লাগে নাই ?

মাহিন কিছু বলল না, প্যান্টের জীপার খুলে রাস্তার পাশে দাঁড়াল— প্রস্রাবের প্রচণ্ড

বেগ হচ্ছে। তার পাশে আলমও দাঁড়াল।

আলম বলল, গলা শুকিয়ে গেছে। কোথাও গিয়ে চা খাই চল। এইখানে বেশিক্ষণ থাকাও ঠিক না। পুলিশ আসতে পারে।

মজিদ বলল, পুলিশ আসবে কেন ?

ওরা গিয়ে নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিয়েছে।

পাগলের মত কথা বলিস নাতো। পুলিশ ? দেশে পুলিশ বলে কিছু আছে না কি ?

কাকরাইল মসজিদের কাছে রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। দোকানি সব গুটিয়ে চলে যাচ্ছিল কাস্টমার দেখে বিরক্ত মুখে কাপ ধুতে বসল।

আলম বলল, চা খেয়ে তারপর কী করবি ? করিমের ওখানে যাবি নাকি ?

মাহিন বলল, না ঐ শালা আমাকে দেখতে পারে না।

করিম ওদের বন্ধুদের কেউ না। করিমের সঙ্গে তাদের পরিচয় রহমানের মারফত। রহমান ছিল তাদের অতিপ্রিয় বন্ধুদের একজন। সে কী করে জানি এক সোনাচোরাচালানির সঙ্গে ভিড়ে যায়। ব্যাংককে ধরা পড়ে। ঐখানের জেলেই এখন আছে। চার বছরের কয়েদ হয়েছে। রহমানের সঙ্গে তাদের এখন কোনো যোগাযোগ নেই। রহমানের বাসায় গেলে তার বড়বোন বের হয়ে আসে এবং অতি কঠিন গলায় বলে, কী চাও তোমরা ?

রহমানের কোনো খবর আছে ?

না কোনো খবর নেই।

এই বলে খট করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়। যেন তারা একদল ভিখিরি। ভিক্ষা চাইতে এসেছে।

রহমানই তাদের করিমের আড্ডায় বেশ কয়েকবার নিয়ে এসেছে। চমৎকার জায়গা। ব্যবস্থাও চমৎকার। আঠারোতলা একটা বিল্ডিং-এর তিনতলায় করিমের থাকার ব্যবস্থা। বিল্ডিং-এর বাইরের স্ট্রাকচার সবে তৈরি হয়েছে। এখন কাজ বন্ধ আছে। করিমের দায়িত্ব হচ্ছে পাহারাদারির। পুরো জায়গাটা করোগেটেড টিন দিয়ে ঘেরা। ঘেরার ভেতর দু'টি কংক্রিট মিকচার, রড সিমেন্টের স্তূপ। তিনজন দারোয়ান নিয়ে এইসব পাহারা দেয় করিম। ইসলাম ব্রাদার্স নামের যে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি বাড়িটা তৈরি করছে করিম হচ্ছে তার মালিকের দূর সম্পর্কের বোনের ছেলে। মালিকপক্ষীয় হাঁকডাক তার গলায় থাকলেও দারোয়ান তাকে মোটেও পাত্তা দেয় না।

পৃথিবীতে কিছু মানুষ এমন থাকে যারা কারো কাছেই পাত্তা পায় না। করিম তাদেরই একজন। অতি অল্পতেই সে অসম্ভব রেগে যেতে পারে আবার সামান্য ধমকে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। জগন্নাথ কলেজে নাইট সেকশানে সে পড়ে। বি.এ. সেকেন্ড ইয়ার তবে অনেক দিন কলেজে যাচ্ছে না। কারণ বেশ কিছু রড চুরি হয়েছে। ইসলাম ব্রাদার্সের মালিক নুরুল ইসলাম তাকে বলে দিয়েছেন এক মিনিটের জন্যেও যেন সে জায়গা না ছাড়ে। নুরুল ইসলাম সাহেবের কথা তার কাছে ঈশ্বরের আদেশের মত। সে গত সাতদিন সত্যি সত্যি এক মিনিটের জন্যেও বাইরে যায়নি।

তার সময় যে খারাপ কেটেছে তাও না। ইসলাম সাহেবের বড় ছেলে মীরন তার ঘরে

একটা ব্ল্যাক লেভেল বোতলের অর্ধেকের বেশি রেখে গিয়েছিল। ঐ বোতল শেষ করে দিয়েছে। মীরন এসে হয়ত চিৎকার চেঁচামেচি করবে। মীরনের বয়স মাত্র উনিশ। এর মধ্যেই ফুর্তির নানান কায়দা-কানুন তার জানা হয়ে গেছে। গত মাসে পনের ষোল বছরের একটা মেয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত। ঝি শ্রেণীর মেয়ে নাম কুসুম। কুসুম একটা ওড়নায় সারাক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছিল। মীরন করিমকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, আপনার ঘরটা ঘণ্টা খানেকের জন্যে একটু ছেড়ে দেন না করিম ভাই।

করিম ইতস্তত করে বলল, মামার কানে যদি যায়...

সঙ্গে সঙ্গে মীরন তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কানে গেলে কী হবে ? আমাকে গিলে খাবে ? যান আপনি গিয়ে বাবাকে বলে আসুন।

আরে না— বলাবলির ব্যাপার না মানে...

আপনি খালি প্যাচাল পাড়েন করিম ভাই। প্যাচাল আমার ভাল লাগে না।

মেয়েটা কে ?

মেয়েটা কে তা দিয়ে আপনার দরকার কী ? ওর নাম কুসুম। আপনি একটা কাজ করুন তো আমাদের জন্যে কাবাব নিয়ে আসুন। মিরপুর রোডে একটা কাবাবের দোকান আছে। বটি কাবাব আনবেন অন্য কিছু না।

মীরন পাঁচশ টাকার চকচকে একটা নোট বের করল। এই ছেলেটির হাত দরাজ। বাপের মত পয়সা কামড়ে থাকে না। কিছু একটা কিনতে দিলে কখনো টাকা ফেরত চায় না।

তবে ছেলেটির মেজাজ বাপের চেয়েও খারাপ। রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। নুরুল ইসলাম সাহেবের চেয়ে তার ছেলেকে করিম বেশি ভয় পায়। মীরন যখন দু'একজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তার ঘরে আসে সে আতংকে অস্থির হয়ে থাকে। সবচে বড় আতংক হচ্ছে ছেলের এইসব ব্যাপার ইসলাম সাহেবের কানে গেলে তিনি কী করবেন ? তখন তার গতিটা কী হবে ?

আলমরা যখন করিমের ঘরে ঢুকল তখন করিম কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। গায়ে প্রবল জ্বর। আলম বলল, আপনার হয়েছে কী ? জ্বর। গায়ে গোটা গোটা কী যেন উঠেছে। মনে হচ্ছে জলবসন্ত।

এখন জলবসন্ত হয় কীভাবে ? কী যে বলেন!

হয়ে গেলে আমি কী করব। এই দেখেন না। করিম শার্ট উঁচু করে দেখাল। সত্যি সারা গায়ে লাল গুটি গুটি কী যেন উঠেছে!

মাহিন বিরক্ত মুখে বলল, আমরা এসেছিলাম আপনার সঙ্গে তাস টাস খেলবো।

করিম বলল, আপনারা নিজেরা খেলেন, আমি দেখি।

পাগল হয়েছেন, আপনার ঘর থেকে জলবসন্তের জীবাণু নিয়ে যাব ?

একটু বসেন। চারদিন ধরে শুয়ে আছি কথা বলার লোক নাই। দারোয়ান এসে খাবার দিয়ে যায়। দারোয়ানের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলা যায় ? ভাই রিকোয়েস্ট, একটু বসেন।

মজিদ বিকৃত মুখে বলল, ইতু রম লাশা।

করিম দুঃখিত গলায় বলল, অসুস্থ মানুষকে এইসব কী বলছেন ভাই ? মরার গালি দেয়া ভাল না।

মজিদ বলল, মরার গালি দিলে কী হয় জানেন না ? আয়ু বাড়ে, আপনার আয়ু বাড়াবার জন্যে মরার গালি দিয়েছি। এখন যাই।

যাচ্ছেন কোথায় ?

যাব আর কোথায় ? চাঁদের আলোয় খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করব।

আপনারা কী সুখেই না আছেন! আমার কোনোখানে যাওয়ার উপায় নেই। শরীর ভাল থাকলেও এইখানে থাকতে হবে। মামার হুকুম।

তাহলে তাই করেন। মামার হুকুম পালন করেন।

করিম বলল, ঘরে একটা জীনের বোতল আছে। মীরন রেখে গেছে। খাবেন ? খেলে বের করে দেই। কথা বলার লোক নেই ভাই বড় কষ্টে আছি।

মজিদ অন্যদের দিকে তাকাল। তার জিনিসটা চেখে দেখতে ইচ্ছা করছে। সে অন্যদের দিকে তাকাল। কাউকেই তেমন উৎসাহী মনে হচ্ছে না। মাহিন বলল, আমি মাফ চাই ভাই। এই জিনিস আমার পেটে যদি যায় আর বাসায় যদি কেউ টের পায় আমার চামড়া খুলে নেবে। সেই চামড়া দিয়ে সবাই এক জোড়া জুতা বানাবে। আমি এর মধ্যে নেই। তোদের ইচ্ছা হলে তোরা খা। আমি বাবা ভদ্রলোকের ছেলে।

মজিদ বলল, এইসবতো ভদ্রলোকেরই খাবার জিনিস।

ভদ্রলোক ভদ্রলোক বেশ-কম আছে। আমরা হচ্ছি পীর বংশ। তুই আর আলম তোরা দু'জন খা যদি ইচ্ছা হয়।

আলম বলল, না আমার ভাল লাগে না। মাথা ধরে।

করিম বলল, এইটায় মাথা ধরে না। ফরেন জিনিস একটু খেয়ে দেখেন।

আলম বলল, আমার অসুবিধা আছে।

করিম বলল, মজিদ ভাই আপনি তাহলে থাকেন। ওরা যাক গিয়ে। দুই জনে সুখ-দুঃখের গল্প করি।

না থাক। অন্য আরেক দিন।

অন্য আরেক দিন এই জিনিস থাকবে না। মীরন সব সময় রেখে যায় না।

রাখবে। না রেখে যাবে কোথায় ?

দলটি বের হয়ে গেল। রাস্তায় নেমেই মজিদ বলল, একটা খুন করতে ইচ্ছা করছে। আয় একটা খুন করি।

বাকি দু'জন হেসে ফেলল।

মজিদ বলল, কী অদ্ভুত ব্যাপার। অস্ত্র হাতে নিলেই হাত নিশপিশ করে।

আলম বলল, তুই ছাগলের মত কথা বলিস নাতো ক্ষুর আবার একটা অস্ত্র নাকি ? তুই যদি ক্ষুর দিয়ে কাউকে মারিস লোকে তোকে মার্ডারার বলবে না, বলবে ক্ষৌরকার। এই অপমানের চেয়ে মরে যাওয়া ভাল না ?

দলের সবাই আবার এক সঙ্গে হেসে উঠলো আর তখনি মীর্জা সাহেবকে তাদের চোখে পড়ল।

মজিদ বলল, পোশাক আশাক দেখে মনে হচ্ছে ফরেন মাল। একা একা ঘুরছে ব্যাটার সাহসতো কম না। ব্যাটাকে ভয় দেখালে কেমন হয় ?

মাহিন বলল, বাদদেতো। এক জিনিস বারবার ভাল লাগে না। ভয়তো একবার দেখালি।

আবার দেখাব। অন্য রকম ভয়। শালার কলজে নড়িয়ে দেব। তারপর কাপড় চোপড় খুলে নেংটা করে ছেড়ে দেব। যা ব্যাটা নেংটা বাবাজি ঘরে যা।

তোর মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে রে মজিদ।

মাথা খারাপ হবে কেন ? ফাজিলটার কাণ্ড দেখ না— এই গরমে স্যুট পরে হাঁটছে। শালা স্যুট দেখাবার জায়গা পাওনা। আমাদের কাছে মামদোবাজি। শুধু আণ্ডারওয়ার পরে যখন বাসায় উঠবি তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল।

বাদদেতো মজিদ।

তুই মজাটা দেখনা। এরকম করছিস কেন ? গরমের মধ্যে স্যুট পরার অপরাধে ব্যাটাকে আমি কানে ধরে একশবার উঠ-বোস করাব। আমার সাথে ফাজলামি!

আলম বলল, স্যুটের উপর তোর এত রাগ কেন ?

মজিদ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, শুধু স্যুট না সব কিছুর উপরই আমার রাগ। কেউ একটা ভাল শার্ট গায়ে দিলে আমার রাগে গা জ্বলে যায়। কোনো বাড়ি থেকে রান্নার সুন্দর গন্ধ এলেও আমার রাগ লাগে। একটা সুন্দর গাড়ি যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখনো রাগে শরীর কাঁপতে থাকে।

তুইতো শালা কম্যুনিস্ট হয়ে যাচ্ছিস।

মজিদ বলল, গরিব দেখলেও আমার রাগ লাগে। ঐদিন কি হয়েছে শোন। এক ফকিরনী আমাকে বলল, বাজান দুই দিন না খাওয়া। রাগে আমার মুখ তেতো হয়ে গেল। বললাম, ভাগো। তুমি দুই দিন না খাওয়াতো আমার কী ?

বলতে বলতে মজিদ মীর্জা সাহেবের দিকে এগিয়ে গেল। বাকি দু'জন বাধা দেবার সময় পেল না। অবশ্যি বাধা দেবার তেমন ইচ্ছাও তাদের ছিল না— চাঁদের আলোয় সামান্য মজা করলে অসুবিধা কী ? তাছাড়া এই গরমে ঐ ব্যাটা স্যুট পরবেই বা কেন ?

৫

মীর্জা সাহেব ঘড়ি দেখলেন।

দু'টা চল্লিশ। তিনি খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। দু'টা চল্লিশ হবে কেন ? ঘড়ির সময় কি বদলানো হয় নি ? এ রকমতো কখনো হয় না। তিনি ঘড়ির ব্যাপারে খুব সজাগ। আজ নিশ্চয়ই পলিনের কারণে সব এলোমেলো হয়ে গেছে। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে আছে মেয়েটি।

মীর্জা সাহেব চারদিকে তাকালেন, কাউকে পেলে সময় জিজ্ঞেস করা যেত। রাত বেশি হলে হোটেলে ফিরে যাবেন। মেয়েটা একা আছে, ফিরে যাওয়াই উচিত অথচ ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। এমন অদ্ভুত চাঁদের আলো তিনি অনেক দিন দেখেন নি। কেমন যেন নেশার মত লাগছে। অস্থির লাগছে আবার এক ধরনের প্রশান্তিও বোধ করছেন।

কে একজন এগিয়ে আসছে। মীর্জা সাহেব বললেন, ক'টা বাজে বলতে পারবেন ?

লোকটি অপ্রস্তুত গলায় বলল, সাথে ঘড়ি নাই। আন্দাজ এগারোটা।

আপনাকে ধন্যবাদ।

লোকটি অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। মীর্জা সাহেবের মনে পড়লো কথায় কথায় ধন্যবাদ দেয়ার রেওয়াজ বাংলাদেশে নেই। এটি পশ্চিমী ব্যাপার। বাংলাদেশে কেউ কোনো ধন্যবাদের কাজ করলে তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসা হয়। এই হাসিতেই ধন্যবাদ লুকানো থাকে।

মীর্জা সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। অন্যমনস্ক না হলে লক্ষ করতেন তিনটি যুবক তার দিকে এগিয়ে আসছে। তিনজনের হাতেই জ্বলন্ত সিগারেট, তিনজনই কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছিল। হঠাৎ এক সঙ্গে তাদের হাসি থেমে গেল। হাসি এবং কান্না এমন জিনিস যে হঠাৎ করে থেমে গেলে অন্যমনস্ক মানুষের কানেও একটা ধাক্কা লাগে, ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। মীর্জা সাহেব সচকিত হলেন। লক্ষ করলেন, তিন যুবকের মধ্যে একজন বেশ খাটো। সে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে এবং তার এক পায়ে স্যান্ডেল অন্য পায়ে কিছু নেই।

ছেলেটি তার হাতের সিগারেট অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুইজনও একই ভঙ্গিতে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল। দৃশ্যটি অস্বাভাবিক। সিগারেটের জ্বলন্ত অংশ আমরা আশেপাশেই ফেলি, এত দূরে ফেলি না। একজন যে জায়গায় যে ভাবে সিগারেট ফেলবে অন্য দুইজনও ঠিক তাই করবে এটাই বা কেমন ? এই তিনজনের মনে কিছু একটা আছে। সেই কিছুটা কী ?

বেঁটে যুবকটি তার দিকে এগিয়ে আসছে। অন্যেরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। বেঁটে যুবকটির হাতে লম্বা কোনো একটা জিনিস যা সে গোপন করতে চেষ্টা করছে। আশেপাশে কোনো স্ট্রিটল্যাম্প নেই বলেই যুবকটির মুখের ভাব ধরা যাচ্ছে না। চাঁদের আলো যত তীব্রই হোক মানুষের মুখের ভাব তাতে ধরা পড়ে না।

বেঁটে যুবকটি মেয়েদের মত রিনরিনে গলায় বলল, আছেন কেমুন ?

মীর্জা সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন, আমাকে জিজ্ঞেস করছ ?

জ্বি না। আফনেরে না। আফনের কান্ধে যে দুই ফিরিস্তা আছে তাহারে জিগাই।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সব কিছু কি বোঝা যায় চাচা মিয়া ? কিছু বোঝা যায়, কিছু যায় না। এই হইল জগতের নিয়ম।

মীর্জা সাহেবের বিস্ময় আরো বাড়লো তবে তিনি তা প্রকাশ করলেন না। এই যুবকরা আসলে কী চায় তা তিনি বুঝতে চেষ্টা করছেন। বেঁটে যুবকটি তার সঙ্গে রসিকতা করার

চেষ্টা করছে। নেশা করে আসেনিতো ? এলকোহলের তিনি কোনো গন্ধ পাচ্ছেন না। এলকোহল ছাড়াও আরো সব নেশার জিনিস আছে। তেমন কিছু না তো ? এমিটোফিন জাতীয় কোনো ড্রাগ ? ঢাকা শহরে এসব কি চলে এসেছে ?

তিনি সহজ স্বরে বললেন, কী ব্যাপার বলতো ?

বেঁটে যুবকটি বলল, য়ভ য়পা না খিদে লাহা।

তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। এই যুবকটি কি কোনো সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করছে ?

বাকি দুজন যুবকও এবার এগিয়ে আসছে। মীর্জা সাহেব বললেন, তোমরা কারা ?

স্বাস্থ্যবান যুবকটি বলল, তুমি তুমি করছেন কেন ? আপনার কি ধারণা আমরা কচি খোকা।

অবশ্যই তোমরা কচি খোকা নও। আমার বয়স অনেক বেশি সেই কারণেই তুমি বলছি।

আপনি কথা বেশি বলেন। নো টক।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বেঁটে যুবকটি বলল, পেটের ভিতর যখন ক্ষুর হান্দাইব তখন বুঝবি বিষয় কী! হালা তুমি তুমি করে। হালার কত বড় সাহস!

লম্বামত জিনিসটা যে একটা ক্ষুর তিনি তা আন্দাজে বুঝে নিলেন। সামান্য একটা ক্ষুর হাতে এই তিন যুবক তাঁকে ঘিরে ধরে আছে। এরা মাগার! পথচারীর টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়। অস্ত্রপাতির বল তেমন নেই। ক্ষুরের মত সামান্য জিনিস নিয়ে পথে নেমেছে।

এটা কি ঢাকা শহরের স্বাভাবিক কোনো দৃশ্য ? তাঁর কাছে রাতের নিউইয়র্ক বলে মনে হচ্ছে। তিনি নিউইয়র্কে দু'বার মাগারদের হাতে পড়েছেন। দু'বারই ওদের হাতে ছিল আট ইঞ্চি ছোরা। প্রথমবার দু'জন কালো ছেলে এসে পথ আটকে দাঁড়াল। একজন নেশার কারণে দাঁড়াতে পারছিল না। ঢলে পড়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় জন নেশা করেনি। সে শীতল গলায় বলল, একটা ডলার দিতে পার। খুবই প্রয়োজন।

তিনি ওয়ালেট বের করলেন এবং নিশ্চিন্ত হলেন ছেলেটি ওয়ালেট ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাবে। তা সে করল না। শান্ত ভঙ্গিতে ডলারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। মীর্জা সাহেব ডলার বের করে দিলেন। ছেলেটি বলল, ধন্যবাদ। আমার এই বন্ধুকে কি তুমি একশ ডলার দিতে পার ? ওর একশ ডলারের খুব প্রয়োজন।

তিনি বললেন, একশ ডলার আমার সঙ্গে নেই সে এই ওয়ালেটটি নিতে পারে।

ধন্যবাদ। ঘড়িটা খুলে দাও।

তিনি ঘড়ি খুলে দিলেন। তখনি ছেলেটি প্রচণ্ড একটা ঘুঁসি তার পেটে বসিয়ে দিল। তিনি ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেলেন। ছেলেটি ফিরেও তাকাল না। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে শিস দিতে দিতে এগিয়ে গেল। একবার পিছনে ফিরেও তাকাল না। ভয়ংকর যে খুনি সেও অন্তত একবার তার খুন করা মৃত দেহটির দিকে তাকায়।

এরাও কি সেই কালো ছেলেটির মত ? মনে হচ্ছে না। এদের চেহারা ভদ্র। অবশ্যি ঐ কালো ছেলেটির চেহারাও ভদ্র ছিল। কী সুন্দর করে কথা বলছিল!

মীর্জা সাহেবকে চমকে দিয়ে বেঁটে ছেলেটি বলল, কিরে হালা কতা কচ না ক্যান ?

বেঁটেজন বাঁ হাতটায় একটা ঝাঁকি দিতেই খচ করে শব্দ হল। ক্ষুরের ফলা খুলে গেল। মীর্জা সাহেব এই প্রথম বুঝলেন— ক্ষুর একটা ভয়াবহ অস্ত্র।

তোর পকেটে কী আছে?

ট্রাভেলার্স চেক। তোমরা এই চেক ভাঙাতে পারবে না।

মীর্জা সাহেবের পেছনে দাঁড়ানো ছেলেটি বলল, চাচামিয়া তাইলে ফরেন মাল। আবুধাবি? নাকি কুয়েত?

বেঁটে ছেলেটি খিকখিক শব্দ করছে। হায়নার হাসির সাথে এই শব্দের একটা মিল আছে। মীর্জা সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, তোমরা আমার ঘড়িটা নিতে পারো। দামি ঘড়ি বিক্রি করলে কিছু পাবে।

তাঁর নিজের শান্ত গলার স্বরে তিনি নিজেই চমকে গেলেন। তিনি যেন বেশ মজা পাচ্ছেন কথা বলতে। চাঁদের আলোয় এই তিন যুবককে কেন জানি মোটেই ভয়াবহ মনে হচ্ছে না। একটা খালি রিকশাকে এই সময় আসতে দেখা গেল। বুড়ো রিকশাওয়ালা, তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ রিকশার গতি দ্রুত করে দিল। এ রকম দৃশ্য সে মনে হয় আরো দেখেছে। এবং সে জানে এইসব ঘটনাকে পাশে রেখে দ্রুত এগিয়ে যাওয়াই নিয়ম। পেছনের ছেলেটি মীর্জা সাহেবের কাঁধে হাত রাখল। আগের মতো মেয়েলি গলায় বলল,

চাচা মিয়া, চলেন এট্টু, সামনে। আপনের লগে একখান কতা আছে।

কী কথা?

কথাটা হইল ব্যাঙের মাথা। কী ব্যাঙ? সোনা ব্যাঙ। কী সোনা...

ছেলেটির কথা শেষ হল না। হাসতে হাসতে তার প্রায় গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হল। যেন এ রকম মজার দৃশ্য অনেক দিন সে দেখে নি। মীর্জা সাহেব বললেন, চল যাওয়া যাক।

এই কথায় যুবকদের মধ্যে একটু দ্বিধার ভাব দেখা গেল। বেঁটে যুবকটি বলল, তবসিমু লইহ।

আবার সেই সাংকেতিক ভাষা। মীর্জা সাহেব আবার বললেন, চল কোথায় যাবে?

স্বাস্থ্যবান যুবকটি ধমকে উঠল, আবার তুমি?

তোমরা বয়সে আমার অনেক ছোট এই জন্যেই তুমি বলছি। অন্য কিছু নয়। তবে তোমাদের যদি অপমান বোধ হয় তাহলে আর বলব না।

বেঁটে যুবকটি চাপা গলায় বলল, নো টক! হাঁট। কুইক মার্চ। লেফট রাইট লেফট।

যুবকরা দ্রুত পা ফেলছে। তিনিও প্রায় সমান তালে পা ফেলছেন। এইসব ক্ষেত্রে আচার-আচরণ খুব স্বাভাবিক রাখতে হয়। কথাবার্তা বলে টেনশান কমিয়ে দিতে হয়। তাই নিয়ম। এই তিনটি যুবকের মানসিকতা তিনি জানেন না। এরা কী পরিমাণ নিষ্ঠুর হতে পারে তাও জানা নেই। দীর্ঘ দিন পর দেশে ফিরেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। এখন হয়ত এ রকম দলছুট তরুণেরা চাঁদের আলোয় অকারণেই মানুষের পেটে ক্ষুর বসিয়ে দেয়।

পলিনের জন্যে তিনি তেমন কোনো দুশ্চিন্তা বোধ করছেন না। পলিন কী করবে তিনি জানেন। মা'র সঙ্গে কথা শেষ করে বাথরুমে ঢুকে খানিকক্ষণ কাঁদবে। তারপর চোখ মুছে ডায়েরি লিখবে। ডায়েরি লিখতে অনেক সময় নেবে যদিও লেখা হবে একটা কী দু'টা লাইন। সেই লাইনগুলিও তিনি জানেন— 'মা মণি তুমি এতো ভালো! বাবাও এতো ভালো! অথচ দু'জন একসঙ্গে থাকতে পারলে না কেন?' এই লাইন ক'টি লিখে সে আবার কিছুক্ষণ কাঁদবে। তারপর চোখ মুছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে। এখন সম্ভবত সে ঘুমুচ্ছে।

মীর্জা সাহেব বললেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

বেঁটে যুবকটি সঙ্গে-সঙ্গে বলল, শ্বশুর বাড়ি। বলেই খিকখিক করে হাসতে লাগল। তার হাতে এখন ক্ষুর নেই। অস্ত্রটা সে তার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে।

বাইশ বছর পর দেশের কী হয়েছে তিনি দেখতে এসেছেন। ভাল সুযোগ পাওয়া গেল প্রথম রাতেই। তবে তিনটি যুবককে দিয়ে পুরো দেশ সম্পর্কে আঁচ করা যায় না। এই তিনটি যুবক হচ্ছে 'র‍্যাণ্ডম স্যামপ্লিংয়ের' একটি স্যাম্পল। বাইশ বছর আগেও এরকম যুবকরা চাঁদের আলোয় শহরের পথে পথে ঘুরতো। হাতে অবশ্যি ক্ষুর থাকতো না। তিনি নিজেই কতো রাতে বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটে-হেঁটে আনন্দ করেছেন। এরা যা করছে তাও এক অর্থে আনন্দ। তাঁদের রাতে হাঁটা বাতিক হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার পর। এগারোটার সময় চা খেতে যাওয়া হতো নীলক্ষেতে। সামান্য এক কাপ চা খেতে লাগতো এক ঘণ্টা। চা শেষ করার পর কেউ না কেউ বলত, খানিকক্ষণ হাঁটা-হাটি করলে কেমন হয়? দু'টো দল হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে। এক দল ফিরে গিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। অন্যদল হাঁটতে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলেই হাঁটতে যেত। এক সময় ক্লান্ত হয়ে রেসকোর্সের মাঠে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা। শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুম এসে যেত। বদরুল একবার পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়ল। মজা করবার জন্যে তাকে ফেলে রেখে সবাই চলে এসেছিল।

এখনকার ছেলেরা কি এরকম করে? তিনি জানেন না। দেশের সঙ্গে তাঁর প্রায় কোনো যোগাযোগ নেই। মামাদের সংসারে মানুষ হয়েছিলেন। তিন মামার কেউই তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। স্কুলের বেতন, নতুন বই-খাতা, পরীক্ষার ফিস, এইসব যোগাড় করবার জন্যে একেক মামার কাছে তিনবার চারবার করে যেতে হতো। পরীক্ষার ফিস হয়তো তিরিশ টাকা। এক সময় বড় মামা বিশ টাকার একটা নোট ফেলে দিয়ে বলতেন, যা-যা আর বিরক্ত করিস না। টাকার দরকার হলেই বড় মামা। মামা কি আর নেই নাকি? আরেকবার আমার কাছে আসলে টান দিয়ে কান ছিঁড়ে ফেলব হারামজাদা। বাকি দশটা টাকার তখনও যোগাড় হয় নি। কীভাবে হবে বা শেষ পর্যন্ত হবে কিনা কে জানে। ছেলেবেলার জীবনটা তাঁর অসম্ভব দুঃখ-কষ্টে কেটেছে। তবে মামারা তাকে পুরোপুরি ত্যাগ করেন নি। আমেরিকা যাবার ভাড়া এগার হাজার টাকা তাঁরাই যোগাড় করলেন। সেই জন্যে মেজো মামির কানের দুল বিক্রি করতে হল। বড় মামি তার বাবার কাছ থেকে ছ'হাজার টাকা ধার আনলেন। যাবার দিন তিন মামাই এয়ারপোর্টে এলেন। বড় মামা এক ফাঁকে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন— মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখিস না। অনেক

যন্ত্রণা দিয়েছি। সুখে থাকিস। এই বলেই ভীষণ কান্নাকাটি করতে লাগলেন। দরিদ্র মামাদের ঋণ মীর্জা সাহেব শোধ করতে পারেন নি। সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। চিঠি দিলে মামারা কেউ জবাব দেন না। বিদেশে চিঠি পাঠানোর বাড়তি খরচটা কেউ করতে চান না বোধ হয়। এক সময় তাঁরা তাঁদের ঝিকাতলার বাড়ি বিক্রি করে ফেললেন। টাকা ভাগাভাগি করে আলাদা হয়ে পড়লেন। মীর্জা সাহেবও কয়েকবার ঠিকানা বদল করলেন। যোগাযোগ কিছুই রইল না। দেশ থেকে আসা একজনের কাছে শুনলেন মেজো মামি মারা গেছেন। মেজো মামার মাথার দোষ হয়েছে। মামাদের এই সংসার জলে ভেসে যাচ্ছে। বড় দুই ছেলে গুণ্ডামি-মাস্তানি করে। তাদের পড়াশোনা কিছুই হয় নি।

মীর্জা সাহেব সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গতি ছিল না। নিজেরই তখন ঘোর দুর্দিন। পাশ করে বসে আছেন। চাকরি জোটাতে পারছেন না। গ্রীন কার্ড নেই। বিদেশীদের চাকরি দেবার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি। ভিসার মেয়াদও গেছে শেষ হয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়। এই বন্ধুর বাড়িতে কিছুদিন ঐ বন্ধুর বাড়িতে কিছুদিন। সেই সময় কেরোলিনের সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় থেকে বিয়ে। আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দার সময় তখন। গ্রীন কার্ড পাওয়ার পরও চাকরি হয় না। গুছিয়ে উঠতে উঠতে অনেক সময় চলে গেল। দেশের কে কোথায় তা নিয়ে ভাববার অবকাশই হল না।

এখন ভাবেন। কাল ভোরেই তিনি মামাদের খোঁজে বের হবেন। খুঁজে বের করা খুব একটা জটিল সমস্যা হবে না।

মীর্জা সাহেব বললেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি? বেঁটে যুবকটি বলল, নো কট। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাংকেতিক ভাষার অর্থ উদ্ধার করলেন। ছেলেটি উল্টো করে বলছে। নো কট হচ্ছে— নো টক। বেঁটে ছেলেটির নামও তিনি জেনেছেন। তার নাম মজিদ। লম্বা ছেলেটি আলম। অন্যজনের নাম তিনি এখন জানেন না।

নাম না জানা ছেলেটি বলল, সিগারেট দরকার। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে।

মজিদ মীর্জা সাহেবকে বলল, আপনার কাছে সিগ্রেট আছে?

না।

ধূমপান করেন না?

এককালে করতাম। এখন করি না।

ক্যানসারের ভয়ে?

হ্যাঁ।

এত বেঁচে থাকার শখ?

মীর্জা সাহেব দু'টি ব্যাপার লক্ষ করলেন, ছেলেটা কথার ধরন বদলেছে। ভদ্র স্বর বের করছে। তাই হয়ে থাকে। পাশাপাশি কিছু সময় থাকা মানেই পরিচয়। নিতান্ত অপরিচিত একজনের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করা যায় কিন্তু পরিচিত কারোর সঙ্গে করা যায় না। সাইকোলজিস্টরা যে কারণে বলেন, খারাপ প্রকৃতির মানুষের হাতে পড়লে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তারা যা বলে তাতেই রাজি হতে হবে। এবং চেষ্টা করতে হবে কথাবার্তা বলার। তাদের কেউ যদি বলে, আমরা এখন তোমাকে গুলি করে মারব তখন

ভয়ে অস্থির হওয়া চলবে না। ভয় খুব সংক্রামক। তোমার ভয় দেখে সেও ভয় পাবে। একজন ভীতু মানুষ ভয়ংকর কাণ্ড করে। পৃথিবীতে হত্যার স্টেটিসটিকস নিলে দেখা যাবে যে বেশির ভাগ খুনগুলি করেছে ভীতু মানুষেরা। কাজেই কেউ তোমাকে হত্যা করতে চাইলে তুমি সময় চাইবে। যাকে বলে কাল ক্ষেপণ। শুধু কথা বলবে। তুমি যদি নন স্মোকারও হও তবু বলবে, আমাকে মেরে ফেলতে চান, আমার কিছু করার নেই। দয়া করে আমাকে একটা সিগারেট দিন। একটা সিগারেট হাতে পাওয়া মানে পাঁচ মিনিট সময় বেশি পাওয়া। খেয়াল রাখবে পাঁচ মিনিট অনেক সময়। এই সময়টা কাজে লাগাবে। এমন ধরনের কথা বলবে যার জন্যে হত্যাকারী প্রস্তুত নয়। যেমন তুমি তার শার্টের দিকে তাকিয়ে বলতে পার— আপনার এই হাওয়াই শার্টের রঙটা চমৎকার। আমার অবিকল এরকম একটা ছিল। এক লোকের হাতের জ্বলন্ত সিগারেটে শার্টটা ফুটো হয়ে গেছে। তোমার কথায় লোকটা হকচকিয়ে যাবে। তার শার্টের মত তোমারও একটা শার্ট ছিল এটা শোনার পর তার সঙ্গে তোমার একটি সূক্ষ্ম বন্ধন তৈরি হবে। তোমার শার্টটি নষ্ট হয়ে গেছে এতে সে তোমার প্রতি খানিকটা সহানুভূতি বোধ করবে। এই সহানুভূতি খুবই সূক্ষ্ম। তবে সুক্ষ্ম হলেও কাজের।

মীর্জা সাহেব বললেন, একটা দোকান খোলা দেখা যাচ্ছে। ওখানে কি সিগারেট পাওয়া যাবে?

তারা জবাব দিল না, কিন্তু খোলা দোকানটির দিকে হাঁটতে লাগল। দোকানের নাম রূপা স্টোর। সাড়ে বত্রিশ ভাজা ধরনের দোকান। বিদেশী কসমেটিকস থেকে আইসক্রিম পর্যন্ত আছে। সঙ্গে কনফেকশনারী। দু'জন কর্মচারী। এরা দুজনই দোকান বন্ধ করায় ব্যস্ত। তারা ঢোকামাত্র বিরক্ত গলায় বলল, দোকান বন্ধ।

মাহিন বলল, পুরোপুরি বন্ধতো এখনো হয় নাই ভাই। এক প্যাকেট সিগারেট নিব— ফাইভ ফাইভ আছে।

আছে বিক্রি হবে না।

কেন হবে না?

একবার বললাম শুনলেন না দোকান বন্ধ করে দিয়েছি।

মজিদ তীব্র চোখে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না। আলম বলল, ভাই রাত হয়ে গেছে সিগারেট পাওয়া যাবে না। আপনার কাছে আছে দিয়ে দেন, চলে যাই।

সারাদিন বেচাকেনা করে কর্মচারী দু'জনেরই মেজাজ খুব খারাপ। রোগা হাড় জিড়জিড়ে যে জন সে-ই কট কট করছে। অন্যজন বেশ বলশালী। সে এতক্ষণ কথা বলেনি। এখন বলল, মালিক ক্যাশ নিয়ে গেছে দোকান বন্ধ করতে বলে দিয়েছে। আপনারা সিগারেটের দাম দিবেন আমি ভাংতি দিতে পারব না।

মাহিন বলল, যা দাম হবে তাই দিব ভাংতি দিতে হবে না।

মোটা কর্মচারী এক প্যাকেট সিগারেট বের করে বলল, পঞ্চাশ টাকা দেন।

মাহিন বলল, বাজারেতো পঁয়তাল্লিশ টাকা, আপনি পঞ্চাশ চাচ্ছেন কেন?

বাজারে পঁয়তাল্লিশ হলে বাজার থেকে নেন।

সে প্যাকেট ঢুকিয়ে রাখল। আলম বলল, প্যাকেটটা ঢুকিয়ে রাখলেন কেন ভাই সাহেব ? কিনব না এমন তো বলি নাই। হয়ত পঞ্চাশ টাকা দিয়েই কিনব।

আলম পঞ্চাশ টাকার নোটটা এগিয়ে দিল।

রোগা কর্মচারীটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, নোটটা বদলে দেন ছেঁড়া আছে।

কোথায় ছেঁড়া ?

এই যে দেখেন স্কচটেপ মারা।

মীর্জা সাহেব এক দৃষ্টিতে আলমের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি খুব অস্বস্তি নিয়ে লক্ষ করলেন ছেলেটির ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠছে। যতদূর মনে হচ্ছে এর কাছে এই পঞ্চাশ টাকার নোটটা ছাড়া আর কিছু নেই। সম্ভবত তার বন্ধুদের কাছেও নেই। মীর্জা সাহেব পরিষ্কার বুঝলেন ঘটনা এখন অন্যদিকে মোড় নেবে। তিনি কি কিছু করতে পারেন ? তাঁর কাছে বাংলাদেশী টাকা নেই। টাকা থাকলে চকচকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট কাউন্টারে রেখে দিতেন। এতে অবশ্যই কাজ হত।

আলম বলল, এই নোট রাখবেন না ?

বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে গেল। মোটা কর্মচারীটি বলল, রেখে দেরে লিটু। ঝামেলা শেষ কর।

তার কথা শেষ হবার আগেই লিটু উল্টে পড়ে গেল। আলম প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটেছে যে আলম নিজেও ঠিক বুঝতে পারল না কী ঘটে গেল। সে তাকিয়ে দেখল লিটু নামের লোকটা দু'হাতে তার নাক চেপে ধরে আছে। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছে।

মোটা লোকটা বলল, এইটা কী করলেন ?

মজিদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, হারামজাদা তুই কানে ধর।

কী কন আপনে ?

হারামি কানে ধর।

খুট করে শব্দ হল। মজিদ খাপ থেকে তার ক্ষুর বের করে ফেলেছে। মোটা লোকটি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। মজিদ হিস হিস করে বলল, কান ধর কানে ধর।

মোটা কর্মচারীটির চোখে ভয় ঘনিয়ে এল। ভয় ঘনিয়ে আসাই স্বাভাবিক। মজিদের পুরো চেহারা পাল্টে গেছে। তার চোখে উন্মাদ দৃষ্টি। এই দৃষ্টি চিনতে কারো ভুল হবার কথা নয়।

আলম লিটুর দিকে এখনো তাকিয়ে আছে। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত পড়ছে। এই দৃশ্য তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে না আবার দৃষ্টিও ফিরিয়ে নেয়া যাচ্ছে না। লিটু বিড়বিড় করে কী যেন বলল, মজিদ তার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় বলল, নখু রেক বলফে।

লিটু কিছুই বুঝল না। কিন্তু মীর্জা সাহেবের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। মাহিন কাউন্টারের এক পাশে রাখা ক্রিকেট ব্যাটের স্তূপের দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

বিকট শব্দ হল। সে ব্যাট দিয়ে বাড়ি মেরে কাউন্টারের কাচের দেরাজ গুড়িয়ে ফেলেছে। ঘরময় কাচের টুকরা।

মোটা কর্মচারীটি প্রায় ফিসফিস করে বলল, মাফ করে দেন ভাইজান। মাফ চাই। মাফ...

মজিদ চাপা গলায় বলল, নখু রেক বলফে। মোটা কর্মচারী আবার বলল, ভাইজান মাফ করে দেন। ও লিটু ভাইজানের পায়ে ধরে মাফ চা।

লিটু সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত মাখা হাতে মজিদের প্যান্ট চেপে ধরল। মজিদ প্রচণ্ড লাথি দিয়ে তাকে কাচের টুকরোর উপর ফেলে দিল। আবার একটি শব্দ হল। মাহিন কাচের আরেকটি দেরাজ ভেঙ্গেছে।

মোটা কর্মচারীটি ভীতু গলায় বলল, লা-ই লাহা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজজুয়ালেমিন। লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সোবাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজজুয়ালেমিন।

মজিদ চড়া গলায় বলল, নখু রেক বলফে।

ভাইজান মাফ করে দেন। ভাইজান মাফ করে দেন।

নখু রেক বলফে।

জানে মাইরেন না ভাইজান। আমার ছোট ছোট দুইটা বাচ্চা।

মোটা কর্মচারীটি কেঁদে ফেলল। মীর্জা সাহেবের আত্মা কেঁপে উঠল। লোকটি ভয় পাচ্ছে। অসম্ভব ভয় পাচ্ছে। এই ভয় সংক্রামক। এই ভয় ঢুকে যাবে মজিদের ভেতর তখন ভয়ংকর কিছু হয়ে যাবে।

মাফ করে দেন ভাইজান। মাফ করে দেন।

আর কোনোদিন কাস্টমারের সাথে খারাপ ব্যবহার করবি ?

না ভাইজান না।

এরপর থেকে কাস্টমাররে বাপ ডাকবি ?

জ্বি ভাইজান ডাকব।

আর মেয়ে কাস্টমার হইলে মা ডাকবি ?

জ্বি ভাইজান ডাকমু।

ওরা বেরিয়ে এল। মীর্জা সাহেব পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন, যদিও তাঁর ধারণা তার কথা এখন আর তাদের মনে নেই। তারা কিছুদূর এগিয়ে একটা লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়াল। এখন বেশির ভাগ লাইট পোস্টেই সোডিয়াম ল্যাম্প। এইটির তা নয়। সাদা টিউব লাইট জ্বলছে।

আলম বলল, মজিদ তোর সারা গায়ে রক্ত। এত রক্ত এল কোত্থেকে ?

মজিদ তাকিয়ে দেখল, সত্যি রক্তে প্রায় মাখামাখি। সে শীতল গলায় বলল, দেখি সিগারেট দে।

আলম বলল, সিগারেটের প্যাকেট তো আনা হয়নি। আসল জিনিসই রয়ে গেছে। আবার যাবি ?

মজিদ জবাব দিল না।

মীর্জা সাহেব বললেন, আবার যাওয়া ঠিক হবে না। এতক্ষণে খবর হয়ে গেছে। লোকজন চলে এসেছে।

মজিদ তীব্র গলায় বলল, আসুক না। ভয় পাই নাকি। আবদুল মজিদ কোনো শালাকে ভয় পায় না। উল্টো সব শালা আবদুল মজিদকে ভয় পায়।

আলম বলল, ক্ষুরটা খাপে ঢুকিয়ে রাখ মজিদ। দেখে ভয় ভয় লাগছে।

লাগুক ভয়। এই ক্ষুর দিয়ে আজ কোনো এক শালাকে আমি কাটব। না কাটলে মনে শান্তি হবে না। এই যে চাচা মিয়া আপনার নাম কী ?

আমার নাম মীর্জা।

তোমাকে আমি কাটব। কাটাকুটি খেলা হবে।

আমি অপরাধটা করেছি কী ?

তুই শালা গরমের মধ্যে কোট পরেছিস। শালা ফুটানি দেখাচ্ছিস।

তোমরা যদি বল তাহলে কোট খুলে ফেলি।

শালা আবার তুমি করে বলে। মজিদ আচমকা এক চড় বসিয়ে দিল।

মীর্জা সাহেব প্রথমবারের মত সত্যিকার অর্থে ভয় পেলেন। তাঁর মনে হল দোকানে ঢুকবার আগে এরা যা ছিল এখন তা নেই। এখন তার সামনে অন্য একদল ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এরা যে-কোনো মুহূর্তে ভয়ংকর কিছু করতে পারে।

মজিদ বলল, চল করিমের ওখানে যাই।

আলম বলল, করিমের ওখানে কেন ?

ঐখানে গিয়ে এই চাচামিয়াকে কোরবানি দিয়ে দিব। চাচা মিয়া স্যুট পরে ফুটানি দেখাচ্ছে।

আলম জবাব দিল না।

দলটি হাঁটতে শুরু করল। মীর্জা সাহেব লক্ষ করলেন মজিদ ছেলেটি এখন আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছে না। অর্থাৎ সে এই মুহূর্তে কোনো শারীরিক ব্যথা-বেদনা অনুভব করছে না। তিনি ঘড়ি দেখলেন। তাঁর ঘড়িতে এখন তিনটা বাজে। অর্থাৎ মাত্র আধ ঘণ্টা সময় পার হয়েছে। এদের সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন বেজেছিল আড়াইটা। বাংলাদেশ সময় এখন কত ? আলম ছেলেটির হাতে ঘড়ি আছে। তাকে কি সময় জিজ্ঞেস করবেন ? জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে ?

মীর্জা সাহেব আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ক'টা বাজে ?

উত্তর দিল মজিদ। চাপা গলায় বলল, চুপ।

মীর্জা সাহেব নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলেন। আকাশের চাঁদ জোছনার ফিনকি ছড়াচ্ছে। চারদিকে দিনের মত আলো।

৬

মজিদ বলল, রেসকোর্সের মাঠে যাবি নাকি ?

কেউ জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সবাই কিছুটা ক্লান্ত। মাহিন বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। তার পিছিয়ে পড়াটা ইচ্ছাকৃত। সিগারেট খেতে হবে। প্যান্টের পকেটে চারটা ইমার্জেন্সি সিগারেট আছে। তারই একটা সে ধরাল। অন্যরা টের পেলে মুশকিল হবে। মাহিন সিগারেটের আগুন হাত দিয়ে আড়াল করে টানছে। তেমন আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হচ্ছে। মজিদ টের পেলে খ্যাচাং শুরু করবে।

মজিদ বলল, কি তোরা যাবি রেসকোর্সের মাঠে ?

আলম বলল, ঐখানে আছে কী ?

মজিদ চাপা গলায় বলল, ফুর্তির জায়গাই হচ্ছে রেসকোর্সের মাঠ। গাছ বড় হয়েছে। অন্ধকার অন্ধকার ভাব। এইসব অন্ধকারে মজার মজার জিনিস দেখবি।

দূর বাদ দে।

বাদ দেব কেন ? ঢাকার লাইফ দেখব না ? আমাদের সঙ্গে ফরেন চাচামিয়া আছে। ফরেন চাচামিয়াকে দেখিয়ে দেই। কী ফরেন চাচামিয়া, দেখতে চান না ?

মীর্জা সাহেব সহজ গলায় বললেন, না।

বিলাতি মেম সাহেব ছাড়া মন বসে না ? নিচে কার্পেট, উপরে ঝাড়বাতি। মেম সাহেবের কোমরে হাত দিয়ে নাচ।

সবাই যে এ রকম করে তা কিন্তু না।

চাচামিয়া বুঝি করেন না ?

না।

চাচামিয়া কি মৌলানা নাকি ?

মীর্জা সাহেব জবাব দিলেন না। দলটি রেসকোর্সের দিকে এগুতে লাগল। মজিদ এখন দলপতি। পছন্দ না করলেও সবাই তার পেছনে পেছনে যাবে। ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন পরিস্থিতিতে হয়ত এদের মধ্যে অন্য কেউ দলের নেতৃত্ব নেবে। তবে আজকের রাতটা মজিদের। সময় নেতা তৈরি করে। ঠিক সময়ে ঠিক নেতা এই কারণেই বের হয়ে আসে।

আলম বলল, পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। খাওয়ার পানি আছে নাকি ?

মজিদ বলল, রেসকোর্সে পুকুর আছে।

ঐ জার্ম ভর্তি পানি আমি খাব, বলিস কী ?

দরকার হলে খাবি। সে রকম তৃষ্ণা হলে সব খাওয়া যায়।

মীর্জা সাহেব লক্ষ করলেন মজিদ ছেলেটা অনেকক্ষণ উল্টো করে কথা বলছে না। সে কি স্বাভাবিক হয়ে আসছে ? ঘোর কেটে যাচ্ছে ? সব বড় ক্রাইম এক ধরনের ঘোরের

মধ্যে করা হয়। ঘোর কেটে গেলে ক্রিমিন্যালরা কিছু করতে পারে না। তাদের মন সাধারণ মানুষের চেয়েও তরল অবস্থায় চলে যায়, অল্পতেই তারা আবেগে অভিভূত হয়। মন্টানা শহরের সেই কুখ্যাত খুনির কথাই ধরা যাক। কী নাম ছিল যেন— জন রেমণ্ড ? নাকি জেনি রে। জেনি রেই হবে। মেয়েলি ধরনের নাম। ঘোরের মধ্যে চলে গেলে গলায় বেল্ট পেঁচিয়ে খুন করত। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ কোনো বাছ বিচার ছিল না। ধরা পড়বার পর পুলিশ যখন জানতে চাইল— কেন খুন করতো ? সে পাইপ টানতে টানতে হাসিমুখে বলেছিল, মরবার সময় লোকগুলি কেমন অদ্ভুত চোখে তাকাত, দেখতে বড় ভাল লাগত।

অদ্ভুত চোখ বলতে তুমি কী বুঝাতে চাইছ ?

তাদের চোখের দৃষ্টিতে ভালবাসা মাখানো থাকতো।

ভালবাসা ?

হ্যাঁ, ভালবাসা। গভীর ভালবাসা। তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না। মৃত্যু পথযাত্রীর চোখ বড় মায়াময়।

এই জেনি রে-ই সুস্থ থাকা অবস্থায় লাল নীল কাগজে মজার মজার ছড়া লিখে ছোট ছোট বাচ্চাদের বিলাতো—

Dick dick dick
My dog is sick
Her dog is long
Sing sing a song.

এক পাবলিশার আবার এইসব ছড়া জোগাড় করে এক বই ছাপিয়ে ফেলল। বইটির নাম Black Rhymes— 'কালো ছড়া'। আমেরিকানরা হচ্ছে পাগলের দেশ।

মাহিনের সিগারেট শেষ হয়েছে। সে এসে দলে যোগ দিয়েছে। তার একা একা সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা কেউ লক্ষ করে নি দেখে সে বেশ খুশি। সে ফূর্তিবাজের গলায় বলল, কী মারাত্মক চাঁদ উঠেছে দেখেছিস নাকি রে মজিদ ?

মজিদ জবাব দিল না। আকাশের দিকে তাকালোও না। এক দলা থুথু ফেলল। মাহিন বলল, সুকান্ত বেঁচে থাকলে এই চাঁদ দেখে আরেকটা বিপ্লবী কবিতা লিখে ফেলত। থ্যাংকস গড যে মারা গেছে।

মজিদ এবারো জবাব দিল না। আবার এক দলা থুথু ফেলল, মাহিন বলল, কথা বলছিস না কেন ?

স্বার্থপর ছোটলোকের বাচ্চার সঙ্গে আমি কথা বলি না।

আমি স্বার্থপর ?

ইচ্ছা করে পেছনে পড়ে গেলি হারামজাদা ছোটলোক।

আরে একটা সিগারেট কেমন করে জানি পকেটে ছিল আমি জানতাম না— আপঅন গড।

আবার মিথ্যা কথা বলছিস ? প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে আবার প্যাকেটে রেখে দিলি...

একটাই সিগারেট ছিল। বিশ্বাস কর খালি প্যাকেট। আপঅন গড।

খালি প্যাকেট কোন শালা পকেটে রাখে ?

মীর্জা সাহেব বিস্মিত হলেন। মজিদের মধ্যে নেতার গুণাবলি চলে এসেছে। দলের সবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। কে কী করছে না করছে তা সে এখন জানে।

মাহিন থমথমে গলায় বলল, সিগারেট যদি প্যাকেটে থেকেই থাকে তাতে অসুবিধা কী ? আমি কি তোর পয়সায় সিগারেট কিনেছি ? গালাগালি করছিস কেন ? ফস করে হারামজাদা বলে ফেললি। শালা তুই হারামজাদা বানান জানিস ?

আলম বিরক্ত মুখে বলল, কী শুরু করলি তোরা। চল হাঁটি।

মাহিন বলল, আমি হাঁটাহাঁটির মধ্যে নেই। বাসায় চলে যাব।

আলম বলল, এখন বাসায় যাবি কী ? মাত্র বারটা চল্লিশ বাজে। নাইট ইজ স্টিল ইয়াং।

বারটা চল্লিশ বাজুক বা তেরটা চল্লিশ বাজুক আমি চললাম।

সত্যি যাচ্ছিস ?

হ্যাঁ সত্যি।

আলম বলল, চল সবাই মিলে চলে যাই। পুলিশে ধরলে মুশকিল। হাজতে চালান করে দিবে। মজিদ, চল যাওয়া যাক।

তোরা যেতে চাইলে যা।

তুই একা একা কী করবি ?

বললাম না একটা খুন করব। দাঁড়িয়ে আছিস কেন চলে যা।

তুই যাবি না ?

না।

আর এই ভদ্রলোককে কী করবি ?

নখু বরক, নখু বরক।

মীর্জা সাহেব চমকে উঠলেন। উল্টো কথা আবার ফিরে এসেছে। ছেলেটা কথাও বলছে তীক্ষ্ণ স্বরে। আগের পাগলামি কি আবার ফিরে আসছে ? সঙ্গের ছেলে দু'টি চলে গেলে ঝামেলা হবে।

মজিদ বলল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? চলে যা।

ওরা গেল না দাঁড়িয়ে রইল। মজিদ রেসকোর্সের দিকে হাঁটতে শুরু করামাত্র তারাও পেছনে পেছনে আসতে লাগল। মীর্জা সাহেব লক্ষ করলেন মজিদ এখন আর পা টেনে টেনে হাঁটছে না। ব্যথাবোধ নিশ্চয়ই নেই। সে তাহলে ঘোরের মধ্যে আছে। ঘোর কাটছে না।

রেসকোর্সের ময়দানে ঢোকা হল না। বৃষ্টিতে কাদা হয়ে আছে। কাদার উপর হাঁটাহাঁটি কারো পছন্দ হল না। তাছাড়া জায়গাটা জনশূন্য। বৃষ্টি হবার কারণেই হয়ত কেউ নেই। মজিদ বলল, চল ফিরে যাই। করিমের কাছে যাওয়া যায়।

আলম বলল, করিমের কাছে কী জন্যে ? জীন খাবি ?

হুঁ।

সবাই আবার ফিরে চলল। কেউ কোনো রকম আপত্তি করল না। মাহিন আবার তার ইমার্জেন্সি স্টক থেকে সিগারেট বের করেছে। এবার সে একা ধরায়নি— অন্য দু'জনকেও দিয়েছে। মাহিন মনে মনে আশা করছিল মজিদ রাগ করে সিগারেট নেবে না। তা হয় নি। মজিদ সহজ ভাবেই সিগারেট নিয়েছে।

দলটা দ্রুত গতিতে হাঁটছে। এত দ্রুত যে মীর্জা সাহেব ঠিক তাল মিলাতে পারছেন না। বারবার পিছিয়ে পড়ছেন। মাহিন তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

মাহিন নিচু গলায় কথা বলা শুরু করল। মীর্জা সাহেবের কথা বলতে ইচ্ছা করছে না তবু বলছেন।

আমেরিকায় আপনি কী করেন ?

একটা ফার্মের সঙ্গে যুক্ত আছি।

কী ফার্ম ?

রিসার্চ ফার্ম। ওরা ওয়াটার সলুবেল পলিমার নিয়ে গবেষণা করে। নতুন নতুন প্রডাক্ট তৈরি করে।

আপনি কি সাইনটিস্ট না-কি ?

হ্যাঁ তা বলা যেতে পারে।

বেতন কত পান ?

অনেক।

অনেকটা কত সেটা বলেন। নাকি বলা যাবে না ?

বলা যাবে না কেন। নিশ্চয়ই বলা যাবে। বৎসরে তিরানব্বই হাজার ডলার পাই।

ট্যাক্স কাটে না ?

সব কেটেকুটে এই পাই।

তিরানব্বই হাজার ডলার মানে বাংলাদেশী টাকায় কত ?

জানি না কত।

হিসেব করে বের করেন কত। বত্রিশ দিয়ে গুণ দেন। ডলার এখন বত্রিশ করে যাচ্ছে।

মীর্জা সাহেব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললেন প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা।

এক বৎসরেই ত্রিশ লক্ষ পান ?

হ্যাঁ।

করেন কী এত টাকা দিয়ে ?

মীর্জা সাহেব জবাব দিলেন না। মাহিন বলল, আপনার গাড়ি আছে ?

আছে।

একটা না দু'টা ?

দু'টা আছে।

বাড়ি কিনেছেন ?

হ্যাঁ।

ক'টা রুম সেই বাড়িতে ?

বলতে পারছি না। দোতলা বাড়ি বেশ কিছু রুম আছে।

নিজের বাড়িতে কটা রুম তাও বলতে পারছেন না।

মীর্জা সাহেব চুপ করে গেলেন। তিনি মাহিনের গলার উত্তাপ টের পাচ্ছেন। ছেলেটা রেগে যাচ্ছে। চাপা রাগ। চাপা রাগ যে-কোনো মুহূর্তে ভয়ংকর রূপে ফুটে বেরুতে পারে।

বাড়িতে সুইমিং পুল আছে ?

আছে।

রাজার হালে আছেন তাহলে।

আর দশটা বিত্তবান আমেরিকানদের মতই আছি।

আপনার লজ্জা লাগে না ?

লজ্জা ?

হ্যাঁ লজ্জা। দেশের মানুষ না খেয়ে আছে আর আপনি সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছেন।

তোমার কী ধারণা আমি সুইমিং পুলে সাঁতার কাটা বন্ধ করলে দেশের লোক খেতে পাবে ?

মজিদ হুংকার দিয়ে উঠল, চুপ কর শালা আবার তর্ক করে।

আমি তর্ক করছি না। প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

শালা তোকে প্রশ্নের জবাব দিতে কে বলেছে ? এই লালটুস শালাকে খুন না করলে আমি শান্তি পাচ্ছি না। শালার মুখের দিকে তাকালে গা কাঁপছে। শালা ত্রিশ লাখ টাকা কামাই করে আমাদের মানুষ মনে করছে না। হারামজাদা বজ্জাত।

মীর্জা সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। মজিদের উন্মাদ রাগ তিনি টের পাচ্ছেন। এই রাগ বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা নদীর প্রবল জলধারার মত। পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে কোনো সময় নিজেই পথ বের করে নেবে।

উনিশশো বাষট্টি সনে নিজেই এ রকম অন্ধ রাগের একটি দৃশ্য দেখেছেন। নীলক্ষেতের লেপ তোষকের দোকানগুলির কাছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এক ভদ্রলোক তার স্ত্রী এবং ছোট মেয়েকে নিয়ে লালরঙের একটা ভোক্সওয়াগনে করে দ্রুত যাচ্ছেন। একটা ছোট বাচ্চা কোনোদিকে না তাকিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হতে গেল। গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল। প্রচণ্ড ব্রেক কষে ভদ্রলোক গাড়ি থামালেন। দরজা খুলে ছুটে গেলেন বাচ্চাটির কাছে। বাচ্চাটাকে রাস্তা থেকে টেনে তোলার আগেই লোকজন তাকে ধরে ফেলল। ঝাঁকড়া চুলের গলায় হলুদ রঙের মাফলার জড়ানো এক যুবক অন্ধ রাগে চেঁচাতে লাগল— হারামজাদা না দেখে গাড়ি চালায়। হারামজাদার চোখ গেলে দেন।

হারামজাদার চোখ দুটো গেলে দেন...। ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে চেঁচাতে লাগল— চোখ গেলে দাও। চোখ গেলে দাও।

মীর্জা সাহেবের মত আরো অনেকের চোখের সামনে ভয়াবহ ঘটনাটা সত্যি সত্যি ঘটে গেল।

আজো এ রকম কিছু ঘটবে। অন্ধ রাগের ছায়া মজিদের চোখেমুখে। তার প্যান্টের পকেটে ভয়াবহ একটি অস্ত্র।

৭

দলটি আবার ঢুকল ইসলাম ব্রাদার্সের আঠারোতলা দালানের চত্বরে। ঢোকার মুখে স্তূপ করে রাখা রডে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মজিদ। যে কোনো পতনের দৃশ্য হাস্যরস তৈরি করে। এই দৃশ্যটি করল না। বরং সবাই মিলে খানিকটা শংকিত বোধ করল। মাহিন বলল, ব্যথা পেয়েছিস ?

মজিদ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, না, আরাম পেয়েছি। অন্য সময় এই কথায় প্রচুর হাসাহাসি শুরু হয়ে যেত আজ হল না। আজ দলটির অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল।

মজিদ সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার দিকে রওনা হল। করিমের কাছে যাবে এইটুকু সে জানে। কেন যাবে তা জানে না। কতক্ষণ থাকবে তাও জানে না। শেষ পর্যন্ত নাও যেতে পারে। তিনতলায় উঠার পর হয়ত আর করিমের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকবে না। সে ফিরে যাবে। দলের অন্যরা কিছুই ভাবছে না। তারা মজিদকে অনুসরণ করছে। মজিদ যা করবে তারা তাই করবে।

তাদের তিনতলা পর্যন্ত উঠতে হল না। দোতলার সিঁড়িতে পা দেয়ামাত্র করিম নেমে এল। তার গায়ে সাদা একটা কম্বল। তাকে দেখাচ্ছে ভালুকের মত। তার জ্বর সম্ভবত আরো বেড়েছে। মুখ কেমন যেন লালচে দেখাচ্ছে। সে উঁচু গলায় বলল, স্টপ স্টপ। আপনারা যান কোথায় ?

দলটা থমকে দাঁড়ালো। সিঁড়িতে বাতি জ্বলছে। সিঁড়ির বাতি মাত্র চল্লিশ ওয়াটের। বাতি এই মুহূর্তে করিমের মাথার উপর বলে তাকে দেখা যাচ্ছে। সে অন্যদের দেখতে পাচ্ছে না। সে যে-কোনো কারণেই হোক অসম্ভব ভীত। মজিদরা থমকে দাঁড়াল। করিম বলল, কে আপনারা ?

মজিদ বলল, আমরা।

আমরা মানে কে ?

মজিদ জবাব না দিয়ে আরো দু'টা ধাপ পার হল। করিম চেঁচিয়ে বলল, স্টপ স্টপ।

মাহিন বিস্মিত গলায় বলল, করিম আমরা এখানে... ব্যাপার কী ?

করিম থতমত খাওয়া গলায় বলল, উপরে উঠবেন না ভাই প্লিজ!

ব্যাপার কী ?

অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা ?

চলেন নিচে যাই। নিচে গিয়ে বলি।

এখানেই বল কী অসুবিধা।

করিম কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ঘরে মীরন ভাই আছে। অন্য সময় আসেন।

মজিদ বলল, ফূর্তি করতে এসেছে ?

করিম জবাব দিল না।

আলম বলল, ফূর্তিবাজ একটা ছেলে তার সঙ্গে দেখা না করে গেলে ভাল দেখায় না।

নো নো। স্টপ।

অসুবিধা আছে ?

বললামতো অসুবিধা আছে।

মজিদ বলল, ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে কথা বলব। আলাপ পরিচয় হবে। এর মধ্যে অসুবিধা কী ? সে কি মেয়েছেলে নিয়ে এসেছে ?

না না, এসব কিছু না।

মেয়েছেলে থাকলে অন্য ব্যাপার ছিল। যখন নাই তখন দেখা করতে অসুবিধা কী ? তাকে নিয়ে খানিকটা ঘুরব। দলে ফূর্তিবাজ একটা ছেলে থাকলে ভাল লাগে।

করিম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ভাই আপনাদের পায়ে ধরি আপনারা চলে যান। কেন আমাকে বিপদে ফেলছেন ? আমি গরিব মানুষ। এখান থেকে বের করে দিলে না খেয়ে মরব।

আলম বলল, চল চলে যাই। যথেষ্ট হয়েছে।

করিম সঙ্গে সঙ্গে বলল, জ্বি ভাই চলে যান। কাল আসবেন। কাল আপনাদের জন্যে ভাল জিনিস যোগাড় করে রাখব। প্রমিস ভাই প্রমিস।

মজিদ বলল, মীরন ভাইয়ার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাব এ কেমন কথা। সঙ্গে মেয়েছেলে থাকলে অন্য কথা।

করিম ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, সঙ্গে মেয়েছেলে আছে ভাই। আজ চলে যান। রিকোয়েস্ট। আপনার পায়ে ধরি ভাই। আই টাচ ইয়োর ফিট।

করিম সত্যি সত্যি পা ধরবার জন্যে এগিয়ে গেল। মজিদ মুখ বিকৃত করে বলল, থাক থাক পা ধরতে হবে না। চলে যাচ্ছি।

থ্যাংকস ভাই। মেনি থ্যাকংস।

মজিদ দু ধাপ সিঁড়ি নেমে গেল। নেমে থমকে দাঁড়াল। করিম বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ভাই চলে যান।

মজিদ কড়া গলায় বলল, ব্যাপারটা কী বলেন তো ? ঠিকমত বলেন। না বললে এই জিনিস পেটের মধ্যে ঢুকে যাবে। এই যন্ত্ররে চিনেন ? এই যন্ত্রের নাম ক্ষুর। সান রাইজ ক্ষুর।

করিম সিঁড়িতে বসে পড়ল।

সে এই দলটিকে কিছুতেই তার ঘরে যেতে দিতে পারে না। ঘরে বিরাট সমস্যা। মীরন বেকুবের মত এক কাণ্ড করে বসেছে। রাস্তায় রাস্তায় ফুল বিক্রি করে এরকম একটা দশ এগারো বছরের মেয়েকে গাড়ি করে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে। মেয়েটার রোগা ভোগা চেহারা কিন্তু দেখতে সুশ্রী। মীরন তাকে কী বলে ভুলিয়ে এতদূর এনেছে সেই জানে— কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে মেয়েটি বেঁকে বসল, আফনে আমারে কই নেন ?

মীরন তার হাত চেপে ধরে বলল, চুপ থাক। টাকা পাবি। মেলা টাকা পাবি। মেয়েটা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, আফনে আমারে কই নেন ? আফনে আমারে কই নেন ?

হৈচৈ শুনে ঘুম ভেঙে করিম নেমে এসে দেখে এই কাণ্ড। সে ভীত গলায় বলল, মীরন কী কর তুমি!

মীরন ভারি গলায় বলল, আপনি এসে এর আরেকটা হাত ধরেন তো। বড় যন্ত্রণা করছে।

মীরন ছেড়ে দাও। ঝামেলা হবে।

আরে দূর দূর।

মীরন ভাই তোমার পায়ে ধরি।

আমার পায়ে ধরতে হবে না। আপনি এর হাতটা ধরেন। হারামজাদির কত বড় সাহস! আমার হাতে কামড় দিয়েছে। রক্ত বের করে দিয়েছে। হারামজাদিকে আমি উচিত শিক্ষা দেব।

মীরন ভাই কথা শোন।

ধুত্তোরী যন্ত্রণা। হাতটা ধরেন।

মীরনের মুখ দিয়ে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখ ঘোলাটে। মনে হচ্ছে রেগে যাচ্ছে। রেগে গেলে এই ছেলে চণ্ডাল। করিম এসে মেয়েটির হাত ধরল। হাত ধরামাত্র মেয়ে সেই হাতে কামড় দিল। মহা বিচ্ছু মেয়ে।

এই বিচ্ছু মেয়ে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে করিমের ঘরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। সেখানে কী হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ মাবুদই জানে। প্রথম কিছুক্ষণ বিকট গোংগানি শোনা গেছে। সেই শব্দ কমে এসেছে। সম্ভবত মুখ চেপে ধরার কারণে। তারপর আর কোনো সাড়া শব্দ নেই।

করিম ক্রমাগত দোয়া ইউনুস পড়ে যেতে লাগল। হে আল্লাহ্ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। এই হারামজাদা মীরন কী বিপদে ফেলল ? বিপদের এই চাকরি আর ভাল লাগে না। এরচে' গুলিস্তানে ভিক্ষা করা ভাল। হে আল্লাহ্ দয়া কর।

আল্লাহ্ দয়া করেন নি। বিপদ কমে নি উল্টো বিপদ আরো বেড়েছে। মজিদ ভাইয়ের মত ঠাণ্ডা ছেলে হাতে ক্ষুর নিয়ে উপস্থিত। এখন কোন ঝামেলা বেঁধে যায় কে জানে!

সঙ্গে কোট পরা ভদ্রলোকই বা কে ? কে জানে। পুলিশের আই.বি-র লোক না তো ? আই.বি-র লোকগুলি এই রকমইতো থাকে।

মজিদ বলল, কথা বলছেন না বিষয় কী করিম ভাইয়া। মেরা পেয়ারা ভাই দিমু জিনিস পেটে হান্দাইয়া ?

মজিদ সিঁড়ি বেয়ে তিন ধাপ এগিয়ে এল। করিম ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, বলছি ভাই। পুরোটা ভেঙ্গে বলছি। শালার কী যন্ত্রণার মধ্যে যে পড়লাম! আপনাদের সাথে ইনি কি পুলিশের লোক ?

বাজে প্যাঁচাল বন্ধ কইরা আসল কথা কহেন বাহে। সময় নাই।

করিম মূল ঘটনা অতি দ্রুত বলে গেল। মনে হল কেউ একজন দাড়ি কমা ছাড়া রিডিং পড়ছে। দম নেবার জন্যেও থামছে না। করিম চুপ করামাত্র মীর্জা সাহেব কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটি কি মারা গেছে ?

জানি না স্যার। আমি কিছুই জানি না। সারাক্ষণ আমি বাইরে ছিলাম।

কতক্ষণ আগের ব্যাপার ?

ঘণ্টা খানেক আগের ব্যাপার। বেশিও হতে পারে। আমার স্যার শরীর খারাপ। জল বসন্ত— মাথার কোনো ঠিক নাই।

তুমি কি মীরন নামের ছেলেটিকে এর মধ্যে একবারও ডেকে জিজ্ঞেস কর নি— কী ব্যাপার ?

করেছি।

সে জবাব দেয়নি ?

জ্বি না।

মজিদ ক্ষুরের ফলাটা টেনে বের করল। মীর্জা সাহেব কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। মজিদের ভঙ্গি, আচার আচরণ এই মুহূর্তে এমন যে-কোনো মানুষ বলে দেবে— মজিদ ঘোরের মধ্যে আছে। এই ঘোর কাটবে না। এই ঘোর কাটবার নয়।

হুড়মুড় শব্দ হল। কারো কিছু বুঝবার আগেই মজিদের প্রায় গা ঘেঁসে ছুটে নেমে গেল করিম।

মজিদ নড়ল না। করিমের প্রতি সে কোনো আগ্রহ বোধ করল না।

আলম প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। চল ভেগে যাই।

মাহিন বলল, আমার মতে এটাই বেস্ট পসিবল এ্যাকশান। করিম হারামজাদার ভাব-ভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছে এখানে মার্ডার ফার্ডার হয়ে গেছে। উপস্থিত থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মজিদ বলল, চলে যেতে চাইলে যা।

তুই যাবি না। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে তুই করবি কী ?

তোদের চলে যেতে বলছি, তোরা চলে যা।

আলম বলল, দোস্ত এটা মাথা গরম করার সময় না। এখানে থাকলেই মার্ডার কেইসে পড়ে যাবি।

তুই চলে যা।

আলম এবং মাহিন সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। তারা নেমে যাচ্ছে তবে একটু পর পর পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। মীর্জা সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বেশ স্পষ্ট স্বরেই বললেন, মজিদ তুমি কী করতে চাও ?

নখু রেক বলফে।

ঐ ছেলেটিকে খুন করতে চাও ?

হ্যাঁ।

আমি কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। যদি সত্যি সত্যি এখানে কোনো হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে আমরা দেখব যেন পুলিশ এসে ছেলেটাকে ধরে। যেন বিচার হয়— আমরা চাই যেন শাস্তি হয়।

পয়সাওয়ালা মানুষদের শাস্তি এদেশে হয় না।

এটা শুধু এ দেশের জন্য সত্যি নয়, এটা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের জন্যে সত্যি। তবু আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন আইন নিজের পথে চলে। তুমি যা করতে যাচ্ছ তার ফল ভয়াবহ। তুমি ফাঁসিতে ঝুলবে। তুমি পয়সাওয়ালা নও। কেউ তোমাকে বাঁচাবে না।

নখু রেক বলফে।

তুমি ক্ষুরটা ফেলে দাও। তারপর আমার সঙ্গে হোটেলে চল। হোটেলের লাউঞ্জে বসে হট কফি খেতে খেতে গল্প করব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে আমি তোমার একটা ব্যবস্থা করে যাব। তুমি কি আমেরিকা যেতে চাও ? যেতে চাইলে সেই ব্যবস্থাও করা যাবে। মানি ক্যান ডু ওয়ান্ডারফুল ট্রিকস।

নখু রেক বলফে।

তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে মজিদ। বেশ পছন্দ হয়েছে। আমেরিকায় তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পার। আমার মেয়েটা একা একা থাকে। সে একজন সঙ্গী পাবে। জীবন চমৎকার একটা জিনিস মজিদ। ইউ ক্যান নট গ্যামবল উইথ ইট। লিসন টু মি। বি রিজনেবল।

মীর্জা সাহেব মজিদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসতে মজিদ হুংকার দিয়ে উঠল, স্টপ।

মীর্জা সাহেব থমকে দাঁড়ালেন।

যান হোটেলে চলে যান। যান বলছি।

মীর্জা সাহেব সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন। মজিদ তরতর করে তিনতলায় উঠে গেল। করিমের দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল।

মজিদ নিচু গলায় বলল, মীরন ভাই ভাল আছেন ?

মীরন ভয়ার্ত গলায় বলল, আপনি কে ?

মজিদ তার উত্তর না দিয়ে আগের চেয়েও নরম গলায় বলল, ভাই সাহেব মেয়েটা কি মরে গেছে ?

মীরন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বুঝতে পারছি না। শরীরতো এখনো গরম। আপনি কে ?

আমার নাম আবদুল মজিদ।

আপনার হাতে এটা কী ?

এটা কিছু না। এর নাম ক্ষুর।

ক্ষুর দিয়ে কী করবেন ?

মজিদ মধুর স্বরে হাসল। হাসতে হাসতেই নরম স্বরে বলল, নখু বরক— খুন করব।

মজিদ নিচে নেমে এসে দেখে মীর্জা সাহেব অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। মজিদ বলল, আপনি যান নি ?

না।

আপনি কি দয়া করে আমাকে বাসায় পৌছে দেবেন ?

নিশ্চয়ই পৌছে দেব।

ফুপা-ফুপুর সঙ্গে একটু দেখা করব। রাতটা থাকব। সকালে পুলিশের কাছে ধরা দেব। আমার বাসা কিন্তু বেশ দূর। আপনাকে অনেক হাঁটতে হবে।

অসুবিধা নেই আমি হাঁটব। তুমি ঠিকমত পা ফেলতে পারছ না। মজিদ আমি কি তোমার হাত ধরব ?

না হাত ধরতে হবে না। চলুন রওনা হই।

তারা দু'জন পথে নামল। মজিদ ছোট ছোট পা ফেলতে ফেলতে এক সময় বলল, স্যার আপনার মেয়েটার নাম কী ?

ওর নাম পলিন।

ও নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ?

হ্যাঁ সুন্দর। তুমি কি ওর ছবি দেখবে ? আমার মানি ব্যাগে ওর ছবি আছে।

মীর্জা সাহেব ছবি বের করে মজিদের হাতে দিলেন।

মজিদ বলল, স্যার আপনার মেয়েটা পরীর মত সুন্দর।

তারা হাঁটছে। ঘুমন্ত শহরের পথে জোছনার আলো। এই চাঁদের আলো বড় অদ্ভুত জিনিস। এই আলোয় চেনা পৃথিবী অচেনা হয়ে যায়। পিচ ঢালা কালো কঠিন রাজপথকে মনে হয় ভাদ্র মাসের শান্ত নদী।

তারা হাঁটছে। পায়ের নিচে নদী। মাথার উপর অন্য এক রকম আকাশ। চারপাশে থৈথৈ জোছনা। যে জোছনা মানুষকে পাল্টে দেয়। যে জোছনায় সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয়।

হুমায়ূন আহমেদ-এর প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২-এ। এই অর্থে তাঁকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রায় সমকালীন এক আখ্যানকার বলা যায়।
জন্ম : ১৯৪৮, ১৩ নভেম্বর, ময়মনসিংহ জেলার কুতুবপুর গ্রামে। রসায়নের ছাত্র, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি পেয়েছেন, পলিমার-কেমিস্ট্রিতে গবেষণার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের এই অধ্যাপক—১৯৮১-তে তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি পান, 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' এ। ১৯৯৪-এ পান সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান একুশে পদক। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৮-এর সার্ধ-দুই দশকে, তাঁর 'উপন্যাস সমগ্রে'র দশম খণ্ডই শুধু প্রকাশিত হয় নি, তার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' এবং এক আশ্চর্য-চরিত্র মিসির আলি'র আখ্যান নিয়ে 'মিসির আলি অমনিবাস'। একাধিক কাহিনী নিয়ে নির্মিত হয়েছে, দূরদর্শন-চিত্র এবং নাটক। তাঁর পরিচালিত ছবি আগুনের পরশমণি শ্রেষ্ঠ ছবিসহ ৮টি শাখায় পেয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। সম্মানিত হয়েছেন— শিশু একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক, অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদকসহ আরো বহু পুরস্কারে।

Chander Aloy Koekjon Jubok_Humayun Ahmed

suman_ahm@yahoo.com

Created with an unregistered version of SCP PDF Builder

You can order SCP PDF Builder for only $19.95USD from
http://www.scp-solutions.com/order.html